

Vol. 2, No. -2, April - June 2012

CHETANA LAHAR - Quarterly Bengali magazine of DAFODWAM
(Democratic Action Forum of Dalits, Women & Minorities)

চেতনা  একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

- অবহেলা যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এসসি, এসটি, ও.বি.সি., সংখ্যালঘু, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, প্রাপ্তগণবাদের কবলা থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন
- উন্নয়নের বাহনায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুষ্টি বাণিজ্যকে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and Brahminism derived from MANU SANGHITA is still the guiding philosophy of the Indian ruling classes. Until the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the victory of class struggle, in whatever form.

Besides taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities (Religious and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publication of books on concerned subjects in different languages.

For Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
30/2 N.P. Road, Kolkata - 700055,
West Bengal, India
Ph:-(0)9331858854

Email- dafodwam@gmail.com
anantaacharya1949@gmail.com

Exchange Price - 35/-

Edited and Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM,
30/2 N.P. Rd, Kolkata - 700055 and Printed at Sakshar Mahan - 4 D.P.S. Rd, Kolkata - 700033



দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
(এপ্রিল - জুন ২০১২)

চেতনা  লহর

সম্পাদকীয়

দলিত সংস্কৃতির গ্রাম দিয়ে মনুবাদী অপসংস্কৃতির শহর ঘেরো

দুঃখজনক হলেও সত্য যে ভারতে দলিত (আমাদের ভাষায় সবরিক্ত) আন্দোলন আশানুরূপ স্তরে পৌঁছতে পারেনি, অথচ ভারতে শাসক সম্প্রদায় এবং তাদের ভিনদেশী প্রভুদের আক্রমণের লক্ষবস্তু এদেশের ভূমিপুত্র আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়। সাম্প্রদায়িকতার পরিমণ্ডল ক্রমশঃই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে প্রান্তবাসী করে তুলছে। নারী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক কোটি দলিত বাঙালী উদ্ধাত্ত নাগরিকত্বহীন হতে চলেছে। বস্তুবাদী মতুরা ধর্ম আজ ভাববাদের কানায় মলিন। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের উত্তরপুরুষরা ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসককুলের পায়ে তলায় অনুগ্রহপ্রার্থী।

এই সবরিক্ত ভারতবাসী, যার অধিকাংশই গ্রামীণ কৃষি জীবনে অভ্যস্ত, শহরবাসী তথাকথিত শিক্ষিত রাষ্ট্রনায়কদের কাছে মতদাতা নয়, বরং নির্দেশপালক মাত্র। মনুবাদের মধ্যে স্বৈরাচারের যে বীজ প্রোথিত ছিল তা আজ এমন বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে যে তা এমনকি দলিত সংখ্যালঘু নারী আন্দোলনের 'মুক্তিদাতা' বা 'মুক্তিদাত্রী' দের গ্রাস করছে। তাই আজ প্রত্যেক মুক্তিকামী মানুষকে ঘোষণা করতে হবে যে আমিই বিকল্প। আনুগত্য আদর্শের প্রতি হোক যেখানে ব্যক্তি বা সংগঠন পথ চলার সহায়ক হতে পারে মাত্র। শর্তহীন দাসত্ব কাম্য নয়। বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে।

আসুন জাতি ও শ্রেণিগত বৈষম্যের শিকার সবহারা নিজেদের বন্ধনামুক্ত সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলি।

CLASS CASTE RELATIONS MARXIST APPROACH

DAFODWAM PUBLICATION

For Collection :-

Mail : dafodwam@gmail.com

or

Call : (0)9331858854



যাঁদের রচনাবলী অবশ্যপাঠ্য

কার্ল মার্কস, জ্যোতি বা ফুলে, রামস্বামী পেরিয়ার,
বেগম রোকেয়া, আশ্বদকর, ভগৎ সিং

যাঁদের রচনাবলী পাঠককে মুক্তমনা হ'তে সহায়তা করবে

অক্ষয়কুমার দত্ত, কোসাধী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন,
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী ভট্টাচার্য,
আরজ আলি মাতুব্বর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আহমেদ শরিফ,
আশিষ লাহিড়ী, ভবানীপ্রসাদ সাহা

কেইদ্বাটুর

শিবনাথ শাস্ত্রী

এই বারেই আমি কেইদ্বাটুর নগরে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে যাই। সে সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা স্মরণ আছে। মাদ্রাজ সমাজের সম্পাদক রঙ্গনাথম মূদালিয়ার মহাশয় ও আমি একত্রে গমন করি। কেইদ্বাটুর সমাজের সভ্যগণ পদনুর স্টেশন পর্যন্ত আগ বাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রেল গাড়িতে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কেইদ্বাটুর অবস্থিতিকালে আমাকে জাতি মানিয়া চলিতে হইবে।

আমি। সে কিরকম হবে? আমি তো বহু কাল জাতি মেনে চলি নাই।

তাঁহারা। তা বললে কি হবে? তা না হলে এখানকার সব কাজ মাটি হবে।

আমি। আমরা বস্তুত যা করি ও মানি তা মানুষের জানাই ভাল। আমরা জাতের প্রশ্ন দিতে পারব না।

তাঁহারা। এ বাংলাদেশ নয়। এখানে জাত যে মানে না সে খৃস্টান বলে পরিত্যক্ত হয়। এখানে অনেক খৃস্টান সম্প্রদায়ও জাত রেখে চলতে বাধ্য হয়েছেন।

(বাস্তবিক তাই। পরে আমি পৈতাধারী খৃস্টান দেখিয়াছি, এবং অনেক জাতমানা খৃস্টানের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইয়াছে।)

এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে আমরা কেইদ্বাটুরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তাঁহারা আমাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গাড়ি রাখিয়াছেন। আহ্বারের সময় এক ব্রাহ্মণ পাচক আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। খহিতে গিয়া দেখি, কেবল আমার আসন, আমার বন্ধু রঙ্গনাথমের আসন নাই। জিজ্ঞাসা করাতে পাচক বলিল, 'তিনি অন্যত্র খাইতেছেন'। কি করি, একাই খাইলাম। আহ্বারের পর তিনি আসিলে শুনিলাম, তাঁহাকে কোথায় একটা অন্ধকার গোয়াল ঘরে লইয়া খাওয়াইয়াছে; তিনি শূন্য, তাই তাঁহার এই শাস্তি। শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। সমাজের সভ্যেরা বৈকালে আসিলে তাঁহাদিগকে বলিলাম।

আমি। তোমরা কর কি? মাদ্রাজে আমি শ্রম বাড়িতে আহ্বার করি, শ্রম স্ত্রী আমাকে রাখিয়া খাওয়ান, উনি সমাজের সেক্রেটারি, আমার বন্ধু;

এখানে ওঁকে খাবার সময় অন্যত্র নিয়ে যাও কেন?

তাহারা (হাসিয়া) -এখানে আমরা কত, আমাদের বন্দোবস্ত; আপনি কিছু বলবেন না।

বন্ধু রঙ্গনাথমণ্ড বলিলেন, 'যেমন চলাছে চলতে দিন, গোল করবেন না'।

কাছেই আমি মৌনাবলম্বন করিলাম, কিন্তু মনটা বড় প্রসন্ন রহিল না।

ইহার পর প্রাতে ও সন্ধ্যাতে আমাদের ভবনে সমাজের লোকের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের জনতা হইতে লাগিল। প্রত্যেক সময়েই দেখি, একটি লোক উপস্থিত থাকে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বিছনাতে বসে না, মাটিতে বসিয়া থাকে। অনুসন্ধান জানিলাম, সে একজন সমাজের সভ্য। এরূপে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে ব্যক্তি একজন 'পঞ্চম'। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চারিবারের বহির্ভূত অস্পৃশ্য লোক। সে সমাজের অনুরাগী সভ্য বটে, কিন্তু অপর সভ্যগণের সহিত একাসনে বসিতে সাহস পায় না। ক্রমে তাহার ইতিবৃত্তাদি তাহার মুখে শুনিলাম। সে পুলিশে কাজ করে, সামান্য বেতন পায়, কেইখট্টর শহরের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটীরে সপরিবারে বাস করে।

একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমার বাড়ি কতদূর? আমি তোমার ঘর ও স্ত্রী-পুত্র দেখিতে চাই।

সে আপনি রোজ প্রভাতে আমার বাড়ির নিকট রাস্তা দিয়া বেড়াইয়া থাকেন।

আমি বটে? তবে কাল পথে দাঁড়িয়ে থেক, আমি আসবার সময় ডেকে নিও।

সে। আপনি সকালে বেরিয়ে এসে দুধ খান, আমার বাড়ি গেলে আপনার খাবার বিলম্ব হবে।

আমি। তুমি আমার জন্য একটু দুধ রেখো, আমি খেয়ে আসব, তাহলেই তো হবে।

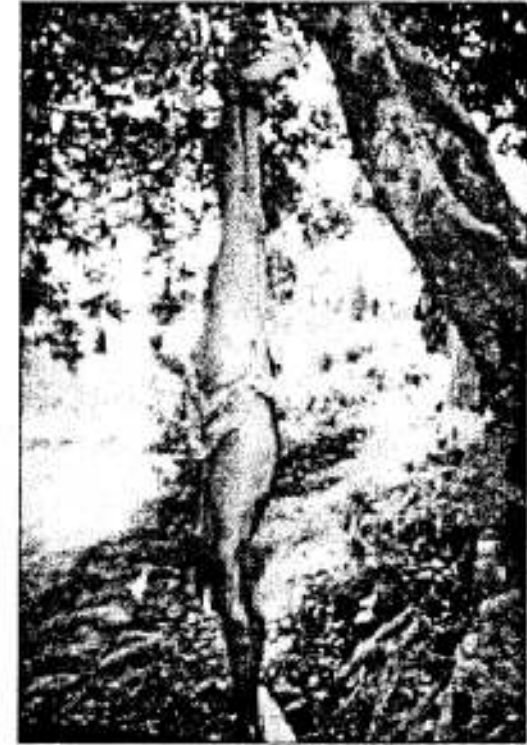
এ প্রস্তাবে সে আশ্চর্যবিত্ত হইল। আমি তখন তাহার কারণ তত অনুভব করিতে পারিলাম না।

এর পরদিন প্রাতে আমি বেড়াইয়া আসিবার সময় তাহার বাড়িতে গেলাম। তাহার উঠানে একটি মোড়া দিল। তাহাতে বসিলাম। তাহার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিলাম, অনেক প্রশ্ন করিলাম, বাংলাদেশের ও ব্রাহ্মসমাজের কথা অনেক বলিলাম। তাহার দুধ ও 'আপম্' দিল, আমি খাইলাম।

ফিরিয়া আসিয়া ঘরে বসিতে না বসিতে এই কথা শহরে ছড়াইয়া পড়িল যে, পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী একজন পঞ্চমার ঘরে গিয়াছেন ও 'আপম্' খাইয়াছেন। সমাজের সভ্যগণ পিল-পিল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 'হায় হায়। কি হল, কি হল? আমি বলিলাম 'খাবার সময় এত কথা মনে হয়নি। আর, সে অনুরোধ করিলেও বা কিরাপে অগ্রাহ্য করিতাম?'

ইহার পর লোকে জানিল, আমি অন্য লোকের অন্ন খাই। তাহার পর শহরের শূদ্র-ভদ্রলোকের বাড়িতে সদলে আমাদের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। কয়েকদিন মহাভোজ চলিল। লোকে জানিয়া লইল যে আমি জাতি মানি না, ইহা জানিয়াও দলে দলে আমার বক্তৃতাদিতে আসিতে লাগিল। সভ্যগণের ভয়ভাবনা দূর হইয়া গেল।



মৃত দলিত শ্রমিক রাজারমোহন, বালিয়া মেলা, উত্তরপ্রদেশ, ২০১১

রাসেল এবং সামাজিক পুনর্গঠন

বি. আর. আবেদকর

ভাষান্তর - সুশান্ত সরকার

মানবের বার্টেন্ড রাসেল রচিত 'সমাজ পুনর্গঠনের নীতিসমূহ' একটি যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থ। সামগ্রিকভাবে যুদ্ধবিষয়ক সাহিত্য প্রচারধর্মী অথবা প্রতিরোধ-ধর্মী রচনা হয়। রাসেলের পুস্তক যদিও পরবর্তী আখ্যার পর্যায়ে পড়ে, তবুও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তক থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অনেকের যুক্তিতে প্রতিরোধ-ধর্মী পুস্তকসমূহের মধ্যে অপ্রাকৃত ভৌগলিক বাধার অন্তর্গত প্রভুত্বপরায়ণ বিজয়ীদের শাসনাধীন অনিচ্ছুক জাতির কথা বলা হয়, অপরপক্ষে, মি. অ্যাঞ্জেলের 'গ্রেট ইলিউশনে'র ন্যায় রচনা দেখাতে চেষ্টা করে যে, যুদ্ধের গণিতে লাভ অপেক্ষা লোকসানই অধিক, এমনকি বিজয়ী জাতিরও। যাই হোক, রাসেলের রচনা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কারণ-নির্ণায়ক গ্রন্থ। তাঁর বিশ্বাস, কেবলমাত্র মানবিক আবেদনের মাধ্যমে যুদ্ধকে প্রতিহত করা যায় না। তিনি বলেন, "কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা নয়, যুদ্ধ প্রতিরোধ করা সম্ভব ইতিবাচক জীবনধর্মী চেতনা এবং যুদ্ধবিরোধী আবেগের দ্বারা। কেবলমাত্র জীবনের সচেতন চিন্তা নয়, জীবনাব্যয়েরও পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন।" তাঁর কারণ নির্ণয় পদ্ধতির ন্যায় তাঁর সমাজ-দর্শনও পৃথক। তাঁর কাছে, 'যুদ্ধের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় মানুষের কার্যধারার উৎস নিরূপণ এবং মানুষ কী ও কী হবে সেই সম্পর্কে সমস্ত আশা পরিপোষণ। এই মত যদি সত্য হয় তা হলে তা সংকটের কালে, পরস্পরাগত উদারনৈতিক দার্শনিক মতবাদ অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয়।

এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি গ্রহণ করেছেন আচরণভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এই অতি প্রয়োজনীয় সংযোজন মানুষের কাজের উৎস সম্পর্কিত একটি অভিনব ধারা। বাইরের ঘটনা আমাদের কাজকে প্রভাবিত করে এই সূত্রটিকে বাতিল করে দিয়েছে এই সংযোজন। যদি তাই হত, আচরণবাদীরা বলবেন তা হলে মানুষ একেবারে অচঞ্চল স্থির হয়ে থাকত, যেটা জীবনবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে অসত্য। মানুষের মধ্যে শক্তির উৎস নিহিত আছে। কারণ সে এইরকম কয়েকটি কাজ করার প্রবণতা নিয়েই জন্মেছে। বাইরের ঘটনা মানুষকে কাজের প্রবণতা দেয় না। তারা শুধু সেগুলিকে অন্য পথে পরিচালিত করে। এই কাজ করার প্রবণতা, আচরণবাদীরা

বলেন, কাজ করতে গিয়ে যে সামাজিক অবস্থায় তারা কাজ করে তার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। আসল প্রবণতাগুলি পরিবর্তিত হয়ে যে রূপ গ্রহণ করে সেটাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীর বিশদ অর্থে এই পরিবর্তনই শিক্ষার ভিত্তি। সব পরিবর্তনই কিন্তু সমান মূল্যবান নয়। যে ঘটনাবলী ও শিক্ষা এইরূপ আচরণ পরিবর্তন করে থাকে, তার মধ্যে কোনগুলি আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এবং কোনগুলিকে বাদ দিতে হবে তা স্থির করবেন সংস্কারকণা, সমাজের কল্যাণে যেগুলিকে রাখার প্রয়োজন তাও স্থির করবেন তাঁরাই। যাই হোক না কেন এর সামাজিক মূল্য অশেষ এবং এই আচরণ পরিবর্তিত হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। এটা সম্ভব, তার একমাত্র নামান্তর, অধ্যাপক ডিউইর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি শুধু হিংসার জন্য 'বল প্রয়োগের' বিরুদ্ধে, কিন্তু 'নৈতিক শক্তির জন্য বল' প্রয়োগের বিরুদ্ধে নন। যারা বল প্রয়োগের বিপক্ষে তাঁদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, এই বল প্রয়োগ ব্যতীত সব আদর্শই বিফল হয়। যেমন কোনও আদর্শ বা উদ্দেশ্য না থাকলে আমাদের সকল কাজই নিষ্ফল হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য এবং উপায় সেই কারণে পরস্পর-নির্ভরশীল এবং উদ্দেশ্য থেকেই উপায়ের সার্থকতা নিরূপিত হয়। বোম্বার ভুলের জন্যই আমরা অনেক সময় এর সম্যক অর্থ অনুধাবন করতে পারি না। যদি উদ্দেশ্য সাধনই উপায়ের সার্থকতা না থাকে তাহলে আর কীসে তা থাকতে পারে? অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে, আমরা যথোপযুক্ত উপায়ের সদ্ব্যবহার করতে বা নিয়ন্ত্রিত করে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি না। কারণ একটি উপায় একবার অবলম্বন করলে অনেক উদ্দেশ্যই আমাদের কাছে প্রকট হয়। সত্যটাকে আমরা বুঝতে পারি না— আর আমরা একটি উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ারও সন্তুষ্ট হই না। যাই হোক, আমাদের জন্য আমরা উদ্দেশ্যের পেছনে 'টি' অক্ষরটি ব্যবহার করে অন্য যে সব উদ্দেশ্যের পথ প্রশস্ত হয় সেগুলি সম্পর্কে মাথাই ঘামাই না। অবশ্যই ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে আমরা যে কোনও একটি উদ্দেশ্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখব। কিন্তু তা করতে গিয়েও আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যে অন্য যে-সব উদ্দেশ্য বিশেষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেগুলিকে যেন ত্যাগ না করি। তাহলে সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে যে, যদি আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়, যা আমরা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করে থাকি, আমাদের দেখতে হবে যে, একটা উদ্দেশ্যের জন্য শক্তি প্রয়োগ করলেও যেন অন্য যে কাজ তার ফলে হবে সেগুলি যাতে বিনষ্ট না হয়। বর্তমান যুদ্ধে এই নীতি প্রয়োগ করা, আমার মনে হয় শক্তি বা বল প্রয়োগের কোনও যৌক্তিকতাই থাকে না। যেটা আমাদের যুক্তিসিদ্ধ করতে হবে তা হল ধ্বংসাত্মক হিংসা। পৃথিবীর মানুষের কাছে ব্যাপারটা যুক্তিগ্রাহ্য

হবে তখনই, যখন দেখানো যাবে বিবদমান পক্ষের যে কোনও পক্ষ হিংসা ছাড়া অর্থাৎ কিছু ক্ষতি স্বীকার না করলে পৃথিবীতে শান্তির স্থায়িত্ব বজায় থাকবে না। এটা বাস্তব সত্য যে, হিংসা কখনও সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায় না এবং অপ্রতিরোধ্যের নীতি তখনই প্রয়োগ করা সম্ভব যখন সেটা প্রতিরোধের নীতি অপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শক্তির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। সংক্ষেপে বলতে হয় যে, কিছু লাভ করার জন্যই আমরা শক্তি প্রয়োগ করব। আমরা অবশ্যই তার প্রয়োগ করব গঠনমূলক শক্তি হিসাবে, ধ্বংসাত্মক উগ্রতা হিসাবে নয়।

যুদ্ধদর্শনের এই বিস্তৃত আলোচনায় সমৃদ্ধির নীতির সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্কের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। প্রয়োজনবোধে আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ এ সম্পর্কে করা সম্ভব। বর্তমান ইউরোপের যুদ্ধ শক্তি প্রয়োগের দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে এক শান্তি ও অপ্রতিরোধ্যের দর্শনের সূত্রপাত করেছে। মি. রাসেলের পুস্তকটি যুদ্ধবিরোধী। গ্রন্থকারকে এজন্য ছ'মাসের কারাবাস করতে হয়েছে। অবশ্য আলোচ্য বইটির জন্য নয়, কিন্তু শান্তির সম্পর্কে ওকালতি করার এবং যুদ্ধবিরোধী কথা বলার জন্য। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, বেশিরভাগ মানুষের মনের গোপন ইচ্ছাই যুদ্ধের ভয়াবহ ফল এড়িয়ে নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন। শক্তি প্রয়োগের নিন্দায় মি. রাসেলের ভূমিকা ছিল কতটা সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। মি. রাসেলের পুস্তকের ভারতীয় পাঠকদের মনে ঘটনাবীলার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে একটি দ্বিতীয় ঘটনা বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এটা বুঝতে হবে যে, শক্তি প্রয়োগের দর্শনের ভূমিকা অবশ্যই নিতে হবে প্রাচ্যদর্শনকে এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ভারতীয় দর্শনকে। তাই ভারতীয় পাঠকদের কাছে মি. রাসেলের প্রকৃত মনোভাবের যথার্থ পরিচয় প্রদান অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়। সতর্কতা অবলম্বন না করলে ভারতীয়দের স্বভাবজ শান্তিপূর্ণ জীবনের অর্থ এবং অপ্রতিরোধ্যের দার্শনিক প্রবণতা রাসেলের রচনায় নিজেদের জীবন দর্শনের যৌক্তিকতা লাভে পরিচালিত করতে পারে।

জীবন সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কি সত্যি বাস্তব? নিৎসে বিক্রপাত্মক ভঙ্গিতে খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে মাত্র একজনই খ্রিস্টান ছিলেন যাকে খ্রিস্টধর্মের মতবাদের অকার্যকরিতার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এই মন্তব্য যদি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে সত্যি হয়, তা হলে প্রাচ্যের জীবন দর্শন সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ যদিও খ্রিস্টধর্মকে বলা হয় পাশ্চাত্যের ধর্ম, কিন্তু প্রাচ্যদেশেই তার উদ্ভব এবং প্রাচ্যের প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় ঐ ধর্মে। মি. রাসেলের

শান্তির দর্শনও ঐ একই সোঁথে দুষ্ট। কিন্তু এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভারতবাসী এই জীবনদর্শনের নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বহুকাল ধরেই অবিচল রয়েছে ঐ দর্শন অনুশীলনে। বর্তমানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের যুগে—দুর্ভাগ্যবশত যে মতবাদ ভারতের সবকিছুকেই উচ্ছেদ স্থান দিচ্ছে, সেই মতবাদই মনে হয় প্রচলিত থাকবে। লক্ষণীয়, যে যুদ্ধের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য অনেকটাই কমে এসেছে এবং প্রাচ্য নিজেকে মহিমাম্বিত করার প্রচেষ্টায় বলছে যে, চূড়ান্ত জড়বাদ আশ্রয় করার ফলেই পাশ্চাত্যে যুদ্ধ এবং ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনাটা অবশ্যই অযৌক্তিক। প্রাচ্যেরও একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমরাও সম্পূর্ণ না হলেও বেশ অনেকটাই জড়বাদী। যুদ্ধের ব্যপারে অবশ্য পাশ্চাত্য দেশগুলির ওপর দোষ চাপানো যেতে পারে। কিন্তু ওঁরাও বলবে, 'কাজ না করা মানোই মৃত্যু। জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে কাজ করার শক্তি। কাজ একেবারে না করার থেকে, এমনকি হিংসাত্মক কাজ করাও ভাল। যেমন যুদ্ধের সময় আমরা করে থাকি, কারণ আমরা যখন কাজ করি, তখন এমন আশাও রাখি যে আমরা ভাল কাজ করতে পারব। বিশ্বয়কর মনে হলেও শান্তিবাদী মি. রাসেলের অভিমত, যুদ্ধও একটা কর্ম যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পায়। তিনি যুদ্ধকে শুধু নিন্দনীয় মনে করেন এই কারণে যে, এর ফলে আসে মৃত্যু এবং ধ্বংস। তিনি মৃদু যুদ্ধকে সমর্থন করেন। তাঁর মতে, 'প্রতিটি মানুষের পক্ষেই প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার যাতে সে অনুভব করতে পারে যে সে তার শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে।' অন্যভাবে বলতে গেলে, সে উন্নত হচ্ছে।

জীবন সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে অনেক যুক্তির মধ্যে একটি হল, সুপ্রাচীন দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ভারত তার জীবনদর্শনের প্রভাবেই আজও বেঁচে আছে। এই বক্তব্যটি প্রায়ই শোনা যায় এবং শোনা যায় এমন মানুষের মুখ থেকে যাদের বক্তব্য ফেলে দেওয়া যায় না বা অগ্রাহ্য করা যায় না। এর পক্ষে প্রমাণ থাক বা না থাক আমি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না। এই অব্যাহত থাকার বিষয়ে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। এই বেঁচে থাকার অনেক পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে সবগুলিই প্রশংসার যোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যথাসময়ে পশ্চাদপসরণ করলে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ বেঁচে যেতে পারে। কার্যকালে নতিস্বীকার করে বা প্রতিরোধ করে বেঁচে থাকাও আর একটা শর্ত হতে পারে। ফলস্বরূপ এটা মেনে নেওয়া ঠিক নয় যে, কিছু মানুষ কয়েক যুগ ধরে বেঁচে আছে বলেই তারা সমৃদ্ধ বা উন্নত হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। তাই শুধু টিকে থাকাটাই আসল গুণ নয়, যে অবস্থায় টিকে আছে সেটাই আসল। মি. রাসেলের ভারতীয়

পাঠকবর্গ যদি এই টিকে থাকার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে দেখেন— এবং শুধুমাত্র টিকে আছেন বলেই আত্মসন্তুষ্ট না হন, তা হলে আমার বিশ্বাস, জীবনদর্শনের পুনর্মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বুঝবেন। মি. রাসেলের যুদ্ধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এইটুকুই বলা হল। এবার আমরা সম্পত্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখব। মি. রাসেল প্রচলিত সমাজের অর্থনৈতিক সংস্থা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছেন। সেগুলি কী রকম সামাজিক কুফল সৃষ্টি করে এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলেছেন। তাঁর সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার তিনি নিজেই করেছেন।

“বর্তমান প্রথার কুফলের উদ্ভব হয়েছে, উপভোক্তা, উৎপাদক এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থের সংঘাতে। এই তিন শ্রেণীর সম্প্রদায়গত বিশেষ এক স্বার্থ বলে কিছু নেই। সমবায় প্রথা উপভোক্তা এবং পুঁজিপতি বা বিনিয়োগকারী স্বার্থের সমন্বয় ঘটায়, শ্রমিকতন্ত্রবাদ উৎপাদক ও বিনিয়োগকারীর স্বার্থ যুক্ত করে। কিন্তু কোনওটাই এই তিন জনের স্বার্থের সমন্বয় করে না। অথবা যারা শিল্প পরিচালনা করে তাদের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থের সমন্বয় হয় না। ফলে শিল্পক্ষেত্রে ঘন্ব থাকবেই এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে মধ্যস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত সমন্বয়ের যে কোনও একটি বা একাধিক নীতি বর্তমান শিল্পনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক হত। আশ্চর্যের বিষয়, যখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনীতিতে গণতন্ত্র প্রথা প্রবর্তনের আন্দোলন করে চলেছে, তখন শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের নীতি, সেটা সমবায়ের আদর্শেই হোক বা ব্যবসা বা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ করেই হোক, যথেষ্ট ফলদায়ক এবং সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে। এটা স্বশাসন বা শ্রমিকতন্ত্র করেও করা সম্ভব। কারণ করেও কোন যুক্তিই আমি খুঁজে পাই না। অতীতে এই প্রথায় প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার তখনও বিশেষ উন্নতি হয়নি, কিন্তু এখন তার কোন প্রয়োজন নেই। এইরকম নীতি প্রবর্তনের ফলে অনেকেই তাদের কাজের জন্য আকর্ষণ অনুভব করবে এবং তারা সৃষ্টিধর্মী কাজ করতেও উৎসাহী হয়ে উঠবে। এই প্রথার জন্য প্রয়োজন, জমির মালিকানা স্বত্বের অবলুপ্তি এবং বিনিয়োগকারীর উপর বাধানিষেধ আরোপ। কিন্তু তার জন্য উপার্জনের সমতা রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। এই প্রথাটি সমাজতন্ত্রের মতো কোনও নিশ্চল বা শেষ প্রথা নয়, শুধুমাত্র শক্তি ও নেতৃত্বে গ্রহণের একটি কাঠামো মাত্র। এইরকম কয়েকটি প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে, আমার বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে বিশাল ব্যক্তিক সংস্থার সমন্বয় ঘটাবে যা আজকের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

শিল্পায়ন প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রচলিত সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে যে, এই প্রথা নীতি-জ্ঞান বিবর্জিত মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে খর্ব করে এবং শ্রমিকদের দাসে পরিণত করে। এই পরিণতি দূর করতে মি. রাসেল খুব সতর্কভাবে বলেছেন, দৃষ্টিভঙ্গি উদার করে এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার ওপর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি বলতে পারি যে, সম্পত্তির প্রভাব সম্পর্কেও ঐ কথা খাটে। অপরপক্ষে, সম্পত্তি বিষয়ক প্রশ্নে তাঁর আলোচনায় কিছু কিছু ভুল ধারণা রয়েছে, যেগুলি প্রকাশিত হওয়া আবশ্যিক।

প্রথম ভুল ধারণায় অর্থের প্রতি লোভ বিষয়ে তাঁর বিবৃতিতে আছে, “এই লোভ মানুষকে তার প্রকৃতি বা স্বভাব নষ্ট করে দেয়, এবং তার কারণ একটি ভুল সিদ্ধান্ত বা মতবাদ, যাতে সে অনুমান করে সে লাভবান হবে এবং তার ব্যবসায়িক বুদ্ধির জন্য প্রশংসা অর্জন করবে। কিন্তু তাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে না। এতে তার মনের সংকোচন ঘটে, জীবনের আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হয় এবং যে যন্ত্রণা সে ভোগ করে তাতে সমগ্র সমাজই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই মনোবৃত্তি প্রাচীনকালে প্রাথমিক জীবনদর্শন বলে পরিচিতি লাভ করেছিল, সম্ভবত তার পিছনে যুক্তিও ছিল। অর্থনৈতিক জীবন ও সমাজের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রচলিত ধারণা অপেক্ষা অনেক বেশি অসঙ্গীত, এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিলে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সত্য বলেই স্বীকৃত হয়। নীতিবাগীশদের অর্থগুরুদের বিরুদ্ধে পুরনো অভিযোগ তাদের সাধারণ অভিযোগের একটি অংশমাত্র এবং অর্থনৈতিক ঘটনাবলী যা থেকে এই বিশেষ বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি নিহিত আছে। এই কথাটা মনে রাখলেই আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে, সর্বহারাদের টক আঙুরের দর্শন একটি মানবিক বিশ্বাস এবং কেনই বা সর্বত্র এত প্রচেষ্টা যা আমাদের জীবনদর্শনের মূল্যবোধকে বিনষ্ট করছে, শুধু যা আমরা পেতে পারি না তা পেতে চেষ্টা করে। যখন আমরা কোনও জিনিস পাই না, আমরা মনে করি, আমাদের ওটা পাওয়া উচিত নয় বা পেলেও লাভ হবে না। যাদের আছে এবং যাদের নেই, এই উভয় শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা বিরূপ পার্থক্য আছে— পার্থিব সম্পদ লাভ করার ক্ষেত্রে। যেমন, ধর্মের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে নীচ জাতি এবং উচ্চ জাতির মধ্যে। প্রত্যেকেই নৈতিক প্রকৃতির কারণে— নৈতিক, এমনকি অনৈতিক হলেও তারা যা করে তার পেছনে একটা গ্রাহ্য যুক্তি খাড়া করে।— তার আচরণকে আদর্শ আচরণ বলে মনে করে। এক সময়ে যখন সারা পৃথিবীতেই যন্ত্রণাদায়ক অর্থনীতির প্রচলন ছিল, যেমন ছিল প্রাচীনকালে, যখন মানুষের পরিশ্রমের হারে উৎপাদনের হার ছিল অত্যন্ত, যখন অনেক

চেষ্টাতেও প্রয়োজনতিরিক্ত কিছু পাওয়া সম্ভব ছিল না, সংক্ষেপে বলতে গেলে, যখন সারা পৃথিবীর মানুষই বাস করত দারিদ্র্যের মধ্যে, সেই সময় নীতিবাণীশরা দারিদ্র্য ত্যাগ, ধর্ম এবং পার্থিব বর্জন করার ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কারণ তখন তাঁরা চেষ্টা করেও কিছু পেতে পারতেন না। 'আনন্দদায়ক অর্থনীতি' সমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, যে জিনিস চাইলেও পাওয়া যায় না তা অবশ্যই মন্দ। যেমন 'প্রাচুর্যের অর্থনীতিতে' কোনও জিনিস সম্ভায় পেলে যেমন আমরা বলে থাকি, জিনিসটা অবশ্যই খারাপ। মি. রাসেলের 'অর্থনীতির' কুফলের এই ব্যাখ্যায় ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ওপর কোন দার্শনিক প্রভাব নেই। এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে, তিনি 'অর্থনীতির' সমালোচনা করেছেন তার কারণ অনুসন্ধান না করেই। সুস্থ মনের মানুষ বলবে, 'অর্থনীতি' বলে যা বলা হয় তা অবাস্তব। অর্থের প্রতি প্রীতি সবসময়েই কোনও জিনিসের জন্য এবং এই কিছুই মধ্যে নিহিত প্রয়োজন যশ বা অপযশের ভাগী করে। এইগুলি বিচার করলে বোঝা যাবে যে মানুষের মধ্যে 'স্বভাবের কোনও নিষ্প্রাণ সমতা' নেই। ব্যক্তিবিশেষে তা ভিন্ন হতে বাধ্য। মানুষের অর্থপ্রীতি থাকলেও প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কারণ ভিন্ন। তাহলে দেখা যাবে, অর্থপ্রীতিকে একটি পেশা ধরলেও অনেক রকমের চরিত্রে তা সংক্রামিত হতে পারে।

মি. রাসেলের গবেষণা যদি উৎপাদনের দিকে থেকে দেখলে দুর্বল মনে হয়, তা হলে উপভোক্তার দৃষ্টিতে তার কোনও মূল্যই থাকে না। মানব চরিত্র যদি শুধু খাওয়া ও ক্ষুধার ওপরই নির্ভরশীল হয় তাহলে আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও উপভুক্তির দিকটাই দেখতে হবে। এখন আমাদের উপভোগ্যের নীতি জেনে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, অবক্ষয়ের কী কারণ আছে? উত্তরটাও নঞর্থক।

উপভোগ্যের সূত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অর্থনীতি সূত্রের উপযোগ-মূল্যেই মতবাদের ফলশ্রুতি। সূত্রটি গৃহীত হয়েছে কুনেটি, গোসেন, ওলারস মেঞ্জার এবং জেবন্স-এর বিখ্যাত মতবাদ থেকে। উপযোগের এই মতবাদকে এখন আর গুণবাচক বলে ধরা হয় না। দেখা হয় কীভাবে মানুষের চাহিদা পূরণ হয়। কোণ বাস্তব উপযোগ এখন অবস্থা বিশেষে মানুষের সন্তোষ বিধানের ওপর নির্ভর করে। এমন কি খাদ্য বা আমরা সকলেই পেতে ইচ্ছা করি, আমাদের ক্ষুধা অথবা রক্তির কারণে আনন্দদায়ক অথবা বিরক্তির কারণ হতে পারে। সন্তোষ বৃদ্ধি হলে উপযোগ হ্রাস পায়। অন্য কথায়, সন্তোষ আমাদের শরীরের বিশেষ কোনও যন্ত্রাংশের বা যন্ত্র-সমষ্টির কাজ। কোনও বস্তুর সঙ্গে ঐ যন্ত্রের

সম্বন্ধ নির্ণয়ে যে চিত্র আঁকা যাবে, তাতে দেখা যাবে যন্ত্রের অবস্থার সঙ্গে সন্তোষ পরিবর্তিত হয় ব্যস্ত অনুপাতে।

মি. রাসেল যদি যন্ত্রসহকারে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকটা দেখতেন, তা হলে অবশ্যই তাঁর এই ভুল ধারণাটা দূর হত। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অর্থ কী? কোনও বস্তুর উপযোগ একেবারে শূন্য হয়ে যায় কেন? যুক্তি দিয়ে বলা যায়, তার কারণ, (১) কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ শরীর-যন্ত্রটি উত্তেজিত হয়ে তার চাহিদার বস্তুটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে অথবা (২) অন্য শরীর-যন্ত্রাংশগুলি অন্য ধরনের সন্তোষ লাভ করতে আগ্রহী হয়ে পূর্বের যন্ত্রটির বিরুদ্ধাচরণ করে। অধ্যাপক গিডিংস শেষের মতটি গ্রহণ করে বলেছেন, যদি কোনও বিশেষ শরীর-যন্ত্রাংশ বা তাদের কয়েকটি সমষ্টিকে যথেষ্টভাবে সন্তুষ্ট রাখা হয়, তাহলে অন্য যন্ত্রাংশগুলির ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং ঐ অবহেলিত যন্ত্রাংশগুলি প্রতিবাদ শুরু করে। যার ফলে সেগুলির সন্তোষ বিধানের প্রয়োজন হয়। অবহেলিত যন্ত্রাংশগুলি আমাদের সচেতন মনকে নাড়া দেয় এবং যে যন্ত্রাংশের সন্তোষ বিধান আমরা করি, সেখান থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে দেয়। উপযুক্ত দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে অধ্যাপক গিডিংস-এর ব্যাখ্যাটিই সম্ভবত নির্ভুল। আচরণ-ভিত্তিক ঐ অনুমান স্মরণে রেখে বলা যায়, শরীর যন্ত্র একটি ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়ায় প্রচলিত হয়। অনুমান করা সম্ভব যে, সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্রের ক্ষুধা আছে এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন যন্ত্রের ক্ষুধা নিবারণ না করলে তারা এইভাবে প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদ আমাদের বাধ্য করে ভিন্ন ভিন্ন উপভোগ্য বস্তুর উপযোগ স্বীকার করতে। এইটাই যদি বাস্তব ঘটনা হয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি না কীভাবে শরীরের একটি যন্ত্র বরাবর প্রাধান্য বিস্তার করে সারা শরীর-যন্ত্রটির ক্ষতিসাধন করতে পারে। অপরপক্ষে, যদিও প্রত্যেক ক্ষুধারই পর্যায়ক্রমে পালা আসে, মানব প্রকৃতি হল সৌভাগ্যক্রমে সারা শরীর-যন্ত্রটি অনুকূল পরিবেশে একইসঙ্গে সুবিন্যাসে বর্ধিত করে। তার খাদ্য, শরীর, মন ও আত্মা বা বুদ্ধির প্রয়োজনে যা সে চায়, তা তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যদি বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যের অভাবে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তা হবে সামাজিক কারণে, নিজের দোষে নয়।

মি. রাসেলের আর একটি অভিযোগ—সম্পত্তি, মানুষের অধিকারের প্রবৃদ্ধিগত হওয়ায় যুদ্ধ ডেকে আনে। মি. রাসেলের সঙ্গে সহমত হয়েছে কলা যায়, ঐচ্ছিক নিষেধ সম্পত্তির প্রভাব সম্বন্ধে রাসেল অপেক্ষা বেশি অবগত ছিলেন। এই প্রভাবের সারাংশ খুঁসিডাইডিসে একটি গল্পাকারে বলেছেন। এক কৃষক তার ফসল আহরণ করে, ফসলের গাদার পাশে

বসে ফসল বাজারে বিক্রি করে কী লাভ হবে সে কথা চিন্তা করছিল। যখন সে লাভের স্বপ্নে মশগুল তখন এক ডাকাত সেখানে হাজির। কৃষকের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কোন কথা না বলে সে অর্ধেক অংশ ডাকাতকে দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় এই বলে যে, মাত্র অর্ধেক দিয়েই সে অব্যাহতি পেয়েছে। ঘটনাটা সত্য না গল্প তা জানা যায় না, কিন্তু এর মধ্যে যে সত্যটি নিহিত রয়েছে তা অনেকেই বুঝতে পারে না। কত লোক যে এই রকম প্রকৃতি নিয়ে অর্থ আহরণ করছে তা বলা যায় না। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা সত্য। নিঃসন্দেহে একথা জানতেন, আর সেই কারণেই তাঁর অতি মানবকে সম্পত্তির অধিকারী করেন নি, পাছে সে তার আহরিত সম্পদ লুণ্ঠ হলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলতে পারেন, বিপদটা সম্পত্তির জন্য নয়, কিন্তু অ-সম বস্তু ব্যবহারের জন্য। কারণ, যাদের কিছু নেই তারা তা পাবার জন্য ধংসাত্মক কাজে নিযুক্ত হতে পারে। বর্তমান কালের শিল্পে যে বিসম্বাদ চলছে, তা এইরকম বঞ্চনার ফলশ্রুতির আর একটি উদাহরণ। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করছে, মালিকদের থেকে অনেক বেশি বলপ্রয়োগ করছে। আগের বিবরণ থেকে তা উপলব্ধি করা যেতে পারে। বাধা পেলে তরবারি ভোঁতা হয়, না পেলে ধার বাড়ে। এইভাবে সম্পত্তি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তথাপি তার ক্ষতিপূরণের ক্ষমতা অনস্বীকার্য।

মি. রাসেলের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে যা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেই মৌলিক দিকটি নিঃশব্দে উপেক্ষা করে যাওয়া অনুচিত। তিনি বলেন, মানুষের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার ধারা দ্বিবিধ। হয় সৃষ্টিধর্মী, না হয় অধিকার ধর্মী। আমাদের কিছু কাজ সৃষ্টির প্রতি ধাবিত হয়, অন্যগুলি অর্জনে অথবা যা আছে সেগুলির রক্ষণে। সবচেয়ে ভাল জীবন তাকেই বলা যায়, যা প্রধানত সৃষ্টিধর্মী, এবং যার অধিকার রক্ষার প্রবণতা কম। আবেগকে কি এভাবে ভাগ করা যায়? এমন কিছু আছে কি যা দিয়ে আবেগ মাপা যায়? এই স্বল্প পরিসরে এত বড় প্রশ্নের আলোচনা সম্ভব নয়। আমি শুধু একটা প্রশ্ন তুলতে চাই, কারণ আমি মনে করি যে, সহজাত প্রবৃত্তির এই পার্থক্য নির্ণয়ে মি. রাসেল সঠিক পথ অবলম্বন করেন নি। প্রত্যেকটি আবেগ যদি জাগ্রত হয় তবে অবশ্যই সৃষ্টিধর্মী কাজ করবে। ফলে সঠিক কি বৈঠক, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সেটা নির্ভর করে সৃষ্টি-পদ্ধতির উপর—ব্যক্তিগতই হোক বা অন্যকিছুই হোক, এবং তার ব্যবহার পদ্ধতির ওপর—সাম্প্রদায়িক বা অন্য কিছু হোক। সাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় যে উৎপাদন হয় তার উপযোগের অধিকার নির্ণীত হয়নি, এমনকি যা মিলিতভাবে ব্যবহারের জন্য, তার ক্ষেত্রেও নয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সম্প্রদায়গত শিক্ষারের কথা এ ক্ষেত্রে তুলতে পারবেন। দ্বিতীয়টির জন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে একটি পরিবারের অবস্থা দেখিয়ে। পরিবারের কোনও সদস্যই অন্যদের সম্মতি ব্যতিরেকে টেবিলের কোনও জিনিস অথবা ঘর সাজাবার কোনও জিনিসের ওপর নিজের অধিকার সাব্যস্ত করতে পারবেন না। যেমন কেউ কোনওদিন সাধারণের সম্পত্তি মনুমেন্টকে নিজের সম্পত্তি বলতে পারেন না। সেগুলি বাড়ির কিন্তু পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই তার নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিজে ব্যবহার করতে পারবেন। সেগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেই কারণে এটি উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রশ্ন, আবেগের প্রশ্ন নয়, যেখানে অধিকার সাব্যস্ত করা যাবে। তাই সৃষ্টিধর্মী এবং অধিকারমূলক বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এবং প্রথমটির বৃদ্ধিকরণ এবং দ্বিতীয়টির হ্রাসকরণ আলাদা হতে বাধ্য। একটার বৃদ্ধি কখনও অপরটির হ্রাসের কারণ হতে পারে না।

এই কথা বলেই আমরা মি. রাসেলের পুস্তকের আলোচনায় ছেদ টানব। এর মধ্যে অনেক কিছুই আছে যাতে ভবিষ্যৎ সমাজের পুনর্গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। মি. রাসেল সমাজ জীবনে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের উপর জোর দিয়েছেন। এ জন্য তিনি যথার্থই ধন্যবাদার্থ। সামাজিক পুনর্গঠন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধের এবং প্রকৃত বোঝাপড়ার উপর নির্ভরশীল—যে সমস্যার প্রতি ইতিপূর্বে বহু সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি পড়ে নি। মি. রাসেলের আবেগ ও সংস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধে সম্পর্কিত ধারণা নিঃসন্দেহে সত্য। যাই হোক, এটা বোঝার জন্য এবং অন্যান্য আরও অনেক সমস্যা যা এই পুস্তকে



স্থান পেয়েছে সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য পাঠকবর্গের কাছে আমি মূল বইটা পড়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। আমি মি. রাসেলকে তাঁর যোগ্য স্থানে রাখার চেষ্টা করেছি। যেখানে আমার মনে হয়েছে তাকে ভুল বোঝার অবকাশ বর্তমান, সেখানে এবং তাঁর অসমালোচক সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কিছু-কিছু ভুল ধারণা, যা তাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে, এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করেছি। মি. রাসেল এবং তাঁর পাঠকবর্গের প্রতি—উভয় ক্ষেত্রেই আমি আমার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থেকেছি।

মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের

সৈয়দ মুজতবা আলী

মুসলমান ধর্ম আরবে যে যুগে জন্মগ্রহণ করিল তাহাকে আরব ঐতিহাসিকেরাই বর্বর (জাহিলিয়া) যুগ নাম দিয়াছেন। মুহম্মদের সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হইতে দেখা যায় আরবদেশ সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে মাত্র পৌঁছিয়াছে। কৃষ্টি বলিতে আরবদের সে-যুগে একমাত্র গৌরব ছিল কবিতা রচনা। সে কবিতাকেও ব্যাপক কাব্য বলা চলে না; প্রেম, মৃত্যুশোক ও শৌর্যবীর্য লইয়াই তাহার কারবার। দ্বিতীয়তঃ যে সব কবিতা জাহিলিয়ার নামে চলে তাহার কতটুকু ধর্ম-পরাক্রম, নামে মুসলমান ওম্মাই বাদশাহদের উৎসাহে পরবর্তী যুগে রচিত হইয়াছিল আর কতটুকু খাঁটি জাহিলিয়া সে লইয়া পণ্ডিতদের তর্কবিতর্ক এখনও চলিতেছে।

কিন্তু এই আরবেরাই যখন পরপর পারস্য, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, স্পেন, তুর্কিস্তান, এশিয়ামাইনর, তুর্কী, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ জয় করিল তখন বিজিত জাতিদের লইয়া তাহারা যে সভ্যতা গড়িয়া তুলিল তাহা যে শুধু সে যুগের মুসলমান, অমুসলমান পণ্ডিতদের চমৎকৃত করিয়াছিল তাহা নহে, এখনও তৎকালীন মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে সমসাময়িক ইয়োরোপীয় সভ্যতার তুলনা করিয়া আশ্চর্য হই।

আরবরা রুমি (বাইজানটাইন) দিগের নিকট হইতে স্থপতিবিদ্যার বর্ণশিক্ষা করিল ও তাহার সঙ্গে পারসিক, মিশরী ও ভারতবর্ষীয় গঠনপ্রণালী মিশাইয়া যে অপূর্ব মসজিদ, সমাধিমন্দির, রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিল তারা স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিদ্যমান। তুর্কিস্তানে সে স্থপতির যে আশ্চর্য বিকাশ হইল তাহার ইতিহাস লেখা আজও শেষ হয় নাই। বাগদাদী খলিফাদের উৎসাহে গ্রীক দর্শনের তর্জমা আরম্ভ করিল; কিন্দি, ফারাবি, ইবনে সিনা তাহার সমৃদ্ধি সাধন করিলেন ও তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের প্রসারতা করিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবীর বিদ্যাকেন্দ্র ছিল বাগদাদ ও কাইরো।

কিন্তু ইসলামের বিজয় অভিযানের আদ্যোপান্ত বর্ণনা ও তাহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষে ইসলাম কি রূপ নিয়া প্রবেশ করিল, বাঙালী মুসলমান সে ধর্ম হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কি পাইয়াছে ও বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বলিতে কি বুঝায় এখানে তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

নিতান্ত অশিক্ষিত বর্বর দেশগুলি বাদ দিয়া ইসলামের জয়যাত্রার অনুসরণ করিলে আরব ছাড়াই প্রথমেই পারস্যে আসিতে হয়। পারসিকরা তখন আরবদের অপেক্ষা অনেকগুণে সভ্য, তাহাদের স্থপতি, কলা, অলঙ্কার, রাজসভার ঐশ্বর্য্য, জীবনযাপনের তৈজসপত্র রণসজ্জার সভ্য বাইজানটাইনদিগের অপেক্ষা কোন হিসাবে নিকট তা ছিলই না বরং অনুমিত হয় পারসিকদিগের প্রভাব তখন বাইজানটাইনের সভ্যতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অশিক্ষিত অসভ্য আরব শুধু যে সেই পারসিকদের পরাজিত ও বশীভূত করিল তাহা নহে, আরবের সরল, দৃঢ় একেশ্বরবাদের সম্মুখে পারসিক দ্বৈতবাদ পরাজিত হইল। ধর্মের ইতিহাসে সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। পারসিকদিগের ধর্ম প্রাচীন, মার্জিত ও সূক্ষ্মচিস্পন্ন ছিল কিন্তু মনে হয় সে ধর্ম সত্য ও অসত্য দুইকে চিরন্তন ও শাশ্বতরূপে স্থায়ী করিয়া নিয়াছিল বলিয়া পারসিক জনসাধারণ তাহাদের উপরে ধনিক ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের যে অত্যাচার যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছিল তাহা হইতে নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না। অসত্য যদি সত্যেরই মত শাশ্বত হয় তাহা হইলে উৎপীড়নের অসত্য হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবে কোন নীতি, কোন মহাপুরুষ, কোন ধর্ম।

মুসলমানরা বলিল অত্যাচার অসত্য, ভগবান অসত্য নষ্ট করেন—মানুষের কর্তব্য অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সত্যাসত্যের দৃষ্ট ও তাহার সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক কি সে লইয়া চুলচেরা শাস্ত্রীয় তর্ক সে যুগে হয় নাই—ধর্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই আপামর জনসাধারণ এরূপ তর্কে যোগদান করে না—উৎপীড়িত প্রজাকুল মুসলমান ধর্মের আশ্বাসে উৎসাহ পাইল। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে মুসলমানের সাম্যবাদ পারসিক সভ্যতাতে নূতন প্রাণ আনয়ন করিল। ক্রমে ক্রমে বাগদাদ পারসিক ও আরবী সভ্যতার সম্মিলিত কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইল।

পারসিক পণ্ডিতমণ্ডলী সরল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাহাদের ধার্মিক মন শুধু শরিয়ত (ক্রিয়াকান্ড) মানিয়া তৃপ্ত হইল না। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে আজ মুসলমান ধর্ম বলিতে আমরা যে সুস্পষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ বিশ্বাস ও আচরণের ফিরিঙ্গি পাই তখনও তাহা গড়িয়া উঠে নাই। শুধু যে চারি ইমাম মালিক, হনবল, হনীফা, ও শাফীর মতবাদ তখন নানারকমের তর্কজাল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে অন্যান্য নানা সম্প্রদায় তাহাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি এই তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কালামীরা গ্রীক দর্শন দিয়া কুরানের বাক্য বিশ্লেষণ ও সমর্থনে নিযুক্ত হইলেন, মতাজিলারা ঈশ্বরের স্বরূপ, স্বর্ণনরক, কর্মফল নিয়া তর্ক জুড়িলেন, কদরী ও জবরীরা কর্মে মনুষ্যের স্বাধীনতা পরাধীনতার আলোচনা করিলেন ও কিরামিতারা একেশ্বরবাদকে এতই উচ্চ আসন দিলেন যে কবীর কৃষ্ণপ্রস্তরকে সম্মানপ্রদর্শন পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রচার করিলেন। শীয়া মতবাদ

মদীনায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাহার পরিপুষ্টি হইল পারস্যে। গণতান্ত্রিক আরবের মধ্যে মুহম্মদের বংশধরগণের বিধিদত্ত অধিকার স্বীকৃত হইল না, কিন্তু প্রাচীন ইরানে ভূপতিকে ঈশ্বরের অবতাররূপে স্বীকার করা হইত বলিয়া আলী ও তাহার বংশধরগণ সেখানে ঐশী শক্তির আধার-রূপে স্বীকৃত হইলেন। পারস্যে তাই আলী ও তাহার বংশধরগণ শুধু যে রাজনৈতিক সমর্থন পাইলেন তাহা নহে, ধর্মক্ষেত্রেও স্বীকৃত হইল যে তাহাদের বাণী আপ্তবাক্য। কুরান যেরূপ অশ্রান্ত ইহাদের বাণীও সেইরূপ পুত, তাহাদের জীবন নিষ্ফলঙ্ক। সুমিরা বলিল কোন মানুষই অশ্রান্ত হইতে পারে না—ধর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিশেষ কোনও অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না—সেখানেও গণতন্ত্র। একমাত্র পণ্ডিতদের সর্ববাদী মতই অশ্রান্ত হইতে পারে—কারণ মুহম্মদ বলিয়াছেন আমার বংশধরেরা কোন বিষয়ে একমত হইলে তাহা ভুল হইতে পারে না। ইহাই মুসলমানের স্মৃতিতে 'ইজমা' রূপে গৃহীত।

ইহার মধ্যে আরেক ভাবতরঙ্গ আসিয়া পারস্যের ধর্মজগৎকে আলোড়িত করিল। নিওপ্রাভিনজিমের রহস্যবাদ ইক্ষুন্দরিয় পুস্তিসাধন করতঃ আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। দুই-একজন সাধু এই রহস্যবাদের (সূফী বা ভক্তিমার্গের) নিকে আকৃষ্ট হইলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন ইহা ইসলামে সম্পূর্ণ নূতন নহে। কুরানের 'নূর' অধ্যায়ে আল্লাহ যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে রহস্যবাদের উৎস পাওয়া যায়। আল্লা যদি নূরই (জ্যোতিঃ) হইলেন, তাহা হইলে শুধু শরিয়তের বিধান মানিয়া তাহাকে কি করিয়া পাবি? মানুষের ভিতর যে নূর আছে তাহাকে পক্ষেদ্রিয়ের তমসাক্ষকর কাটাওয়া সেই বিশ্বনূরের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাহার জন্য কৃষ্ণসাধন দরকার—ধ্যানের প্রয়োজন। আর কে না জানে মুহম্মদ ঐশী বাণী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে মাসের পর মাস হিরার পর্বত কন্দরে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সূফীরা বলিলেন শাস্ত্রের তর্কজালে বন্দী হইয়ো না; স্বয়ং মুহম্মদ যে মার্গ গ্রহণ করিয়া নূর পাইয়াছিলেন সেই পথ ধরো।

পারস্যে সূফীসাধনা প্রসার করিল। তাহার মূল তত্ত্ব হইল শরিয়ত অনুসরণ করিয়া পক্ষেদ্রিয়ের সংযম করিবে। সেবাবারা গুরুকে (মুরশিদ) তুষ্ট করিবে, তিনি দিবেন জ্ঞান—পূর্বেই বলিয়াছি শীয়ারা ইমাম ও হজজৎকে (গুরু) অশ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। আর সর্বশেষে ভক্তির সাধনা ঈশ্বরকে রসস্বরূপে আরাধনা করিয়া সমাধি হইবে। পক্ষেদ্রিয়ের কর্মদ্বার রুদ্ধ হইবে ও তাহার চরম পরিণতি পরমালোকের সহিত মানবের ক্ষুদ্র আলোকের সম্মেলন—'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই'। হার্টেন প্রভৃতি জার্মান পণ্ডিতদের মতে সূফীর 'আন ল-হক্' (আমিই ঈশ্বর) ভারতবর্ষীয় প্রভাবে গঠিত হইয়াছিল—হয়ত বৌদ্ধনির্ব্বাণও তাহাতে যুক্ত হইয়াছিল। মাসিম প্রভৃতি ফারসী পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়া

এলেন, সূফীমার্গের এই চরম ফল পারস্যের নিজস্ব সম্পত্তি। সে তর্ক এখানে অবাস্তব।

সূফীমার্গের সাধনা পারস্যের চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করিল। প্রাচীনপন্থীরা ঘোর প্রতিবাদ তুলিলেন কিন্তু তাহার সমাধান করিলেন সাধু গজ্জাল। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, শাক্তজপণ্ডিত ও সূফী। তাহার অপূর্ব লেখনীর বলে সূফীমতবাদ পাণ্ডিত্যে হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোন্নিখিত বহু মত সূফীধর্মের ভিতরে আসিয়া আশ্রয় লইল।

এখানে ফারসী ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

আরবেরা বহু দেশ জয় করিয়াছে, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আরবী চালাইয়াছে। ফলে সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিশর, সুদান, লিবিয়া, মরক্কো, সাহারা, স্পেন সর্বত্রই আরবী ভাষা মুসলমান জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহন হইল। শুধু তুর্কী, ইরান, আফগানিস্তান, চীন ও ভারতবর্ষে আরবী চালাইতে পারিল না। কিন্তু তৎসঙ্গেও মুসলিম কৃষ্টি ইসলাম জগতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না।

ফারসী ভাষা আর্যবংশীয়া কিন্তু আরবী সেমিতি। তথাপি আরবী ফারসীকে শব্দসম্পদে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিল যে ইংরিজির সঙ্গে লাতিনের যে সম্পর্ক, ফারসী-আরবী, উর্দু-আরবী ও তুর্কী-আরবীতে আজ সেই সম্পর্ক। দৈনন্দিন কথাবার্তা লাতিন-বর্জিত ইংরাজিতে যদি বা দুই চারিটি বলা চলে মনোজগতে প্রবেশ করিয়া কোনও ভাব বা সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ করিতে হইলেই লাতিনের দরকার। আরবী বর্জিত ফারসীতে যদি বা নাম-ধাম-সাকিন জিজ্ঞাসা করা যায়, দর্শন, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা আরবী-বর্জিত ফারসীতে অসম্ভব। তুর্কী, উর্দু ও সিন্ধি ভাষাতেও তাই। বাংলা ও গুজরাতি বহু আরবী (ও ফারসী) শব্দ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু চিন্তার জগতে তাহার শব্দ খণ করে সংস্কৃত মহাজনের নিকটে। কিন্তু সে আলোচনা পরে হইবে।

কাজেই যদি বা ইরানে ফারসী প্রচলিত রহিল তাহার রূপ যা হইল তাহা আবেগতা পণ্ডিত নিজেরাই মাতা বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। ফারসী আরবীর শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া ধনী হইল—ভাষার মাধুর্য তাহার পূর্বেই ছিল। সূফী কবিরা সেই মধুর ও গম্ভীর ভাষাতে অপূর্ব রসধারার সৃষ্টি করিলেন। ধর্মপণ্ডিতদের তাড়নার ভয়ে ভীত না হইয়া ফারসী জনসাধারণ একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল সূফী কবি মওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর কেতাব ফারসী কুরান। ফিরদোসির মহাকাব্য, সাদীর নীতিকবিতা, হাফিজের সুরা ও সাকীর গজল, এমনকি উমরে খাইয়ামের অজ্ঞেয়বাদ সমস্তই ফারসী-সাহিত্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমাজে সভাসদ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে আরবী শব্দভাণ্ডারের গুণে ইসলামি চিন্তাধারার স্রোত ফারসী সাহিত্যে প্রবহমান রহিল।

মুসলমানেরা এদেশে আসিল প্রধানতঃ আফগানিস্তানের উপর দিয়া। এখানে আফগান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা নিম্নরোজন কারণ আফগান সংস্কৃতি নামক কোন পদার্থ নাই। আফগানরা পশতু ভাষায় কথা বলে কিন্তু সে ভাষাতে তাহারা লেখাপড়া করে না। পারসিক সভ্যতাই আফগান সভ্যতা। কাবুল বা গজনির কবি ফারসীতেই কবিতা লিখেন, মসজিদ নির্মাণ পারসিক ইমারতের সাদৃশ্যেই গঠিত হয় আর আফগান সুফী ও ইরানি সুফীর ধর্মবিশ্বাসে কোনও পার্থক্য নেই। ভারতবর্ষে যখন মোগলরা রাজত্ব করিত তখন আফগানিস্তানের পূর্বাংশ তাহাদের হাতে ছিল। কাবুল গজনি ইহঁতে কবির আসিয়া দিল্লীর রাজদরবারে ফারসী কবিতা শুনাইতেন ও হিরাতের কবির যাইতেন ইরানে। দুই দলের লেখাতে কোনও পার্থক্য নাই।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য যে ভাষা নির্মাণ করিলেন তাহার নাম উর্দু। আরবরা ইরানে যে রকম পারসিক কাঠামোর উপর আরবীর কাদা রঙ লাগাইয়া ফারসী ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ মোগলেরা উত্তর ভারতবর্ষে প্রচলিত দেশী ভাষার কাঠামো লইয়া উর্দু গড়িলেন। পার্থক্য এইমাত্র যে ফারসীতে শুধু আরবী যোগ করা হইয়াছিল, উর্দুতে আরবী ও বিস্তর ফারসী শব্দ লাগানো হইল। ফলে ইরানে যাহা হইয়াছিল উত্তর ভারতবর্ষে তাহাই হইল। সৈন্যদল কথাবার্তা যদি বা আরবী-ফারসী বর্জিত উর্দুতে বলা চলে চিন্তার জগতে সে ভাষা লইয়া পদক্ষেপ করিবার উপায় নাই। এক কথায় আরবী ছাড়া যে রকম ফারসী অচল ঠিক সেইরূপ আরবী ফারসী ছাড়া উর্দু অচল।

উর্দু ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভিতরে দুই চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইল। একদল কুরান, হাদীস, ফিফা ধর্মশাস্ত্রের উর্দু তর্জমা করিতে লাগিলেন, তাহার নূতন টিকাটিপ্পনি, নূতন আলোচনা, নূতন তর্কবিতর্ক। ইহাদের উৎসাহ ইরানিদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল কারণ ইরানিরা শীয়া। তাহারা আরব মুসলমানদের অধিকাংশ সুন্নি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। শুধু কুরান আর কিছু হাদীস লইয়া তাহারা নিজধর্ম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন অথবা সুফীতত্ত্বে মগ্ন হইয়া শাস্ত্রালোচনা উপেক্ষা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা সুন্নি ধর্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া তাহারা খাঁটি আরবী ধর্মশাস্ত্রের উপর জোর দিলেন বেশী। ভারতবর্ষ ধর্ম ও দর্শনে মহাদেশ কাজেই মুসলমান শাস্ত্রচর্চা এদেশে এমন উৎসাহ পাইল যে বহু নূতন আরবী কৈতাবও লেখা হইল, অনেক আরবী পুস্তকের প্রথম

মুদ্রণ এদেশেই হইল; আজ পর্যন্ত হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ও লক্ষ্ণৌয়ের নওল কিশোর প্রেসে ছাপা আরবী বই মিশর, দমমস, বাগদাদ ও ইয়োরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীতে সমাদৃত। এইসব শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রলিখনে মুসলমানদের ভাষার দিক দিয়া কোনেই অসুবিধা হইল না, কারণ পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি যে উর্দু এমনভাবে গড়া হইয়াছিল যে তাহাতে যদুচ্ছা আরবী শব্দ ব্যবহার করা যায়। ইহার আরেকটি তুলনা দেওয়া যাইতে পারে— দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলি দ্রাবিড় কিন্তু সেগুলিতে সংস্কৃত শব্দ এত অধিক মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে যে আর্য সংস্কৃতি তাহাতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় ধরা হইল সুফীতত্ত্বের প্রচার ও প্রসার। কিন্তু তৎপূর্বে এইখানে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের কিঞ্চিৎ ইতিহাসের প্রয়োজন।

সকলেই জানেন বৌদ্ধধর্মের পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বের জাতির শাস্ত্রে অধিকার ছিল না। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার ধর্ম বর্ণের কৌলীণ্য স্বীকার করেন নাই। আপামর জনসাধারণ ধর্মে পূণ্যধিকার দাবি করিল কারণ ধর্ম বদলাইলে মানুষের মন বদলায় না; বৌদ্ধধর্মে তাহারা যে অধিকার পাইয়াছিল হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিয়া সেই অধিকার দাবী করিল। তখন হইল ভক্তিমার্গের প্রচার। একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে ভক্তির সাধনা ছিল না। কারণ বেদের বরুণ মন্ত্র ইহঁতে আরম্ভ করিয়া, মহাভারতের শান্তিপর্বে, গীতায়, ভাগবতে, পাঞ্চরাশ্রে, নারদ শাস্ত্রাদির সূত্রে ভক্তির যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইয়াছিল কিন্তু ভক্তির পূর্ণ প্রসার হইল বৌদ্ধধর্মের লোপের পর মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহার পর আজ পর্যন্ত ভক্তির বিজয় অভিযান এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভক্তিমার্গের ব্যাপকতম প্রসার হইল গৌণতঃ মুসলমান ধর্ম প্রচারের ফলে।

পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধধর্ম ইহঁতে প্রত্যাবর্ত হিন্দুরা ধর্মে অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের পক্ষে আরেকটি যুক্তি হইল প্রতিবেশী মুসলমানের ধর্মে পূণ্যধিকার। যে শূদ্র দুইদিন পূর্বে মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পাইত না সে কিনা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া মসজিদে অবাসে প্রবেশ করিতে লাগিল। হিন্দুরা দেখিয়া বিস্মিত হইল যে সেই নব-মুসলিমের বিশ্বাস, ক্রিয়াকর্মে ও মুসলিম পণ্ডিতের ক্রিয়াকর্মে কোনও পার্থক্য নাই।

অস্পৃশ্য ও শূদ্রেরা সম্ভবতঃ এ উদাহরণ তর্কস্বরূপ ব্রাহ্মণদের দরবারে পেশ করে নাই। কিন্তু গণ আন্দোলন তর্ক ও যুক্তির পাকা রাস্তা দিয়া চলে না। প্রতিবেশীর উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ফলে ফলে নানা পথ দিয়া আসিয়া শাস্ত্রবন্ধনের বেড়ার উপর ধাক্কা লাগায়—বীখন

চুটিতে থাকে।

ভক্তির চারি আচার্য তবু শূদ্রকে শাস্ত্রে অধিকার দেন নাই। তাহাদিগকে ধর্মে পূর্ণ অধিকার নিবার চেষ্টা করিলেন বাঙলা দেশের মহাপুরুষ—শ্রী চৈতন্য। তিনি যে-যুগে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন যে ইসলামের বিজয় অভিযান যদি রুদ্ধ করিতে হয় তবে চণ্ডালকে, শূদ্রকে এমনকি যে হিন্দু মুসলমান হইয়া গিয়াছে তাহাকে, এক কথায় আপামর সর্বসাধারণকে ধর্মে পূর্ণাধিকার দিতে হইবে। বল্লভ নিম্বার্ক যে সাহস দেখাইতে পারেন নাই মহাপ্রভুর দ্বারা তাহা সম্ভব হইল। কিন্তু চৈতন্যের উদার ধর্ম পাণ্ডিত্যভিমানী ব্রাহ্মণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। যে উদ্দেশ্য লইয়া বৈষ্ণবধর্মে প্রচার হইল তাহা সফল হইল না সত্য, তবু হিন্দুসমাজে প্রচুর উদারতা প্রবেশ করিল।

এই উদারতার দর্শন সূফীদের প্রচারকর্মের সুবিধা হইল। পূর্বেই বলিয়াছি ভক্তি ও সূফীতত্ত্ব দুই-ই প্রেমরসাত্মক। শাক্তীয় মুসলমান ধর্মে মিলন হইল না—সে মিলনের চেষ্টা রাজপুত্র দারা শি কোহর মত দুই একজন পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু প্রেমের গঙ্গ-যমুনার মিলন হইল। উত্তর ভারতবর্ষে কবীর, দাদু; মহারাষ্ট্রে সন্তোজী, মুহম্মদ উভয়ধর্মের শাস্ত্রের শাসনকে উপেক্ষা করিয়া মধুর কণ্ঠে প্রেমের গান গাহিলেন। সে গান মসজিদে মন্দিরে প্রবেশ করিল না কিন্তু ধর্মপিপাসার্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিল। আজও উত্তর ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া ধর্মে উদার গুজরাত ও কাঠিয়াওয়াড়ে সে গান গীত হয়।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের এই চেষ্টা সাধুরা করিয়াছিলেন প্রেমের দ্বারা। আরেক দল চেষ্টা করিলেন ধর্ম-বিশ্বাসের সম্মেলন দ্বারা। তাহা হইতে খোজাদের ধর্মের সৃষ্টি হইল (আগাখান এই দলের ইমাম বা গুরু)। খোজারা শীয়া কিন্তু বিশ্বাস করে যে বিষ্ণু নয়বার পৃথিবীতে মৎস্য, কুর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শুধু যেখানে বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করে ভবিষ্যৎকালে বিষ্ণু কঙ্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন সেখানে খোজারা বিশ্বাস করে যে আলী (শীয়াদের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) কঙ্কিরূপে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসান, তৎপরে হুসেন ও বংশানুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া আগাখানে আসিয়াছে। আগাখান তাই শুধু পীর বা ইমাম নহেন তিনি সাক্ষাৎ কঙ্কি। খোজারা তাই কুরান পড়ে না, তাহাদের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ তাহাদেরই এক পীর কর্তৃক গুজরাতিতে লেখা 'দশাবতার'। খোজারা জকাত দেয় না—আগাখানকে 'দশোন্দ' দেয়, হজে যায় না, আগাখানকে প্রদর্শন করে—তাই তাঁহাকে প্রায়ই বোম্বাই আসিতে হয়। রমজান মাসে উপবাস করে না ও নামাজ পড়ে তিনবার, তাও আরবীতে

নয়, হয় কচ্ছী নয় গুজরাতিতে। পাঞ্চরাত্রে যে সব দেব দেবীর উল্লেখ আছে তাঁহাদের নাম উপাসনার সময় স্মরণ করে। বিষ্ণুর নয় অবতারকে বিশেষ ভক্তি নিবেদন করে আর আগাখান ত স্বয়ং বিষ্ণু।

নওসারীর মতিয়া গুজরাতিরাও হিন্দু-মুসলমানের একতার চেষ্টার ফল। তাহারা রমজানে উপবাস করে, কিন্তু নমাজ পড়ে না। বিবাহে ব্রাহ্মণকে ডাকে, কিন্তু মৃতদেহ দাহ করে না, গোর দেয়। সে সময় ডাক হয় মোল্লাকে। মতিয়াদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের ইতিহাস ও বর্ণনা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

মালেকানার রাজপুত্ররা আধা হিন্দু আধা মুসলমান। একই পরিবারে কাহারো নাম আশরফ উদ্দীন, কাহারো নাম প্রতাপ সিং। কয়েক বৎসর পূর্বে তাহাদের ধর্ম নিয়া তামাম হিন্দুস্থানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এইবার বাঙলাদেশে ইসলাম কিরূপে প্রকাশ পাইল তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

উর্দু ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভিতরে দুই চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইয়াছিল পূর্বেই বলিয়াছি। উর্দু ফারসীর ন্যায় আরবী শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করায় শাস্ত্রালোচনায় তাহার কোনও বিঘ্ন হয় নাই—ইসলামি চিন্তাধারা উর্দুতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল। বাঙলাদেশেও এই দুই চিন্তাধারার সৃষ্টি হইল অর্থাৎ (১) উর্দুর দ্বারা কুরান, হাদীস, ফিকা ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা ও (২) সূফীমতের প্রসার।

(২) সূফীমত তাহার নানা শাখাপ্রশাখায় কাদেরিয়া, কলমিয়া, নকশাবন্দী নানা সম্প্রদায় এদেশে প্রসার লাভ করিল। বাঙালী সূফীরা জিকর বা ভজন করেন, বারখার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 'হাল' বা দশা প্রাপ্ত হন, সেতার বা একতারা যোগে মধুর গান করেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাধিস্থ হন। এক কথায় বাঙালী সূফী ইরান ও উত্তর ভারতবর্ষের সূফী ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন।

কিন্তু ইহার প্রভাবে অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যে রসধারার সৃষ্টি হইল তাহা অপূর্ব ও আধ্যাত্মিক জগতে তাহাদের যে মিলন হইল পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার স্থান পাওয়া উচিত। আউল, বাউল, মুন্সীদিয়া, দরবেশী, সাঁই, মরমিয়া, জারীগান, গাজীর গীত সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উঠিয়াছে তথাপি সে গীতে বাঙালী ভক্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে পরিচয় পাই তাহার সহিত কোন দেশেরই-ইয়োয়োরোপের বলুন আর এশিয়ার বলুন—লোক-সাহিত্যের তুলনা হয় না।

এ সম্পদের সম্পূর্ণ আহরণ এখনও হয় নাই। যেটুকু সম্ভব পাওয়া গিয়াছে তাহার বিশেষ লক্ষণ তাহাতে সর্বধর্মসম্মত। তাহারই দুই-একটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

বেদান্তের আত্মা পরমাত্মার অনন্যতা, মায়াবাদ, মনসুর অল-হুজাজের “আনা” ল হক” বহু গীতে অতি সরল ভাষায় অভিজ্ঞতার অন্তঃস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে;

আপনার আপনিরে মন না জানো ঠিকানা
পরের অন্তর কেটে সমুদ্র কি যে যাবে জানা?
পর অর্থে পরম ঈশ্বর, আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল বারামখানা, শতদল সহস্রদল অনন্ত করুণা,
সিরাজ সাই বলে লালন গুরুপদে ভূবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে না;

আত্মা আর পরমাত্মা নিত্য জেনে নে না।

(মতিলাল দাস, বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪১)

‘অশিক্ষিত’ হাসন রাজার তত্ত্বজ্ঞান ও ‘স্পর্ধা’ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় :

আমি হইতে আত্মা, রসূল আমি হইতে কুল।
পাগল হাসন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।
আমি হইতে আসমান জমীন, আমি হইতেই সব
আমি হইতে ত্রিজগৎ, আমি হইতে রব।
আজ্ঞেল হইতে পয়দা হইল মাবুদ আত্মার
বিশ্বাসে করিল পয়দা রসূল আত্মার
মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে, মুসলমানী দীন
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়,
আমি হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়।
মরণ জীবন নাইরে আমার, ভাবিয়া দেখ ভাই
ঘর ভাঙ্গিয়া ঘর বানানি, এই দেখতে পাই।

(হাছন উদাস, ৮৫)

অক্ষরে না ধরে নাম শ্যাম বিনোদিয়া
দেখ, ভোলা মন আপন ঘরে আছে ছাপাইয়া।।
চুরি করো ধারি করো আপনার লাগিয়া
আপনার নামে আসবে শমন সব যাবে পলাইয়া।।
আত্মা আদম দুইদম একদম করিয়া
আদমপুরের বাজারে গোলাঘর বাঁধিয়া।।
সবাল আলী কহিল মুরশীদ চরণে ধরিয়া
অক্ষরে না ধরে নাম তাই দেও বাতাইয়া।।

(সৈয়দা হবীব উন-নিসার সংগ্রহ)

‘আত্মা’ আর ‘আদম’ (মানুষ) আদমপুরে (মানুষের ভিতরে) গোলাঘর বাঁধিয়া বসিয়া আছেন, সবাল আলী তাই মুরশীদকে চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহার পূর্ণ নাম, পূর্ণ স্বরূপ কি?

সাধ্যা দর্শনের স্থান মুসলমান ধর্মে নাই— ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে আত্মা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আদম ও পরপর মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু শীয়া ও সুফী বাতিনিয়ারা (ইহারা বিশ্বাস করেন কুরানের এক বাহা—জাহির—অর্থ ও আরেক গুহা—বাতিন—অর্থ আছে) বলেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আত্মা ও নূর (জ্যোতিঃ) দুই চিরন্তন সত্তা বিরাজিত ছিলেন। সেই নূর আদমে প্রকাশিত হইয়া তাহার পুত্রে সঞ্চারিত হয়। যুগ যুগ ধরিয়া সেই জ্যোতি নানা মহাপুরুষের ভিতর দিয়া আসিয়া মহাপুরুষ মুহম্মদের পিতামহে দুই অংশে বিভক্ত হয়, তাহার এক অংশ মুহম্মদের উদ্ভাসিত (জাহির) হয় ও অন্য অংশ আলীতে গোপন (বাতিন) থাকে। মুহম্মদের নূর তাঁহার কন্যা ফাতিমাতে যায় ও আলীর গুণে ও ফাতিমার গর্ভে যে সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের ভিতর সেই ঋণ্ডিত নূর সংযুক্ত হয়। বাতিনিয়ার এই বিশ্বাস যে আত্মা-নূর আবহমান কাল হইতে বিদ্যমান সাধ্যার পুরুষ-প্রকৃতিতে সাড়া পাইয়াছে—

অপারের কাভার নবিক্সী আমার
ভজন সাধন বৃথা গেল নবি না চিনে।
নবি আউয়াল ও আখির
জাহির ও বাতিন
কোন সময় কোন রূপ

ধারণ করে কোন খানে।
আসমান জমীন জলধি পবন
নবীর নূরে করিলেন সৃজন,
তখন কোথায় ছিল নবীজীর আসন
নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার।
আল্লা নবী দুটি অবতার
আছে গাছ বীজেতে যে প্রকার,
গাছ বড় না ফলটি বড়।
তাও নাও হে জেনে।
আত্মতত্ত্বে ফাজিল যে জনা
সেই জানে সাহিযের নিগূঢ় কারখানা,
হলেন রসূলরূপে প্রকাশ রব্বানা
অধীন লালন বলে দরবেশ সিরাজ সাহিযের গুণে।

(মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৪৯)

মুসলমান সৃষ্টিতত্ত্বে বৈষ্ণবের লীলার স্থান নাই কারণ ভগবান মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন
তাঁহার স্তব করিবার জন্য কিন্তু বাঙালী সুফীরা আত্মতত্ত্বে লীলার স্থান দিয়াছেন —

লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলে করলেন প্রচার,
জানলে আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায়

(মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৫৯)

আর লালনেরই মত পূর্ববঙ্গের কবি সৈয়দ শাহ নূর আপনার শরীরে (ওজুদ) বৈষ্ণব
লীলার কারখানা মৌজুদ' দেখিয়াছেন। তাই উপদেশ দিলেন বৈষ্ণব প্রেমের দ্বারা
পঞ্চেন্দ্রিয়ার মোহ কাটাইয়া সত্ত্বরূপে পরিপূর্ণ হইতে — তাহাই ফানা।

রসিক চাইয়া প্রেম করিয়া যার দিন ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।
অজুদে মজুদ হইয়া লীলার কারখানা,
সৈয়দ শা নূরে কইল দেখলে তনু ফানা।

(সৈয়দা হবীব উন-নিসার সংগ্রহ)

শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্ম মুসলমান কবির হৃদয় স্পর্শ করিল, 'বিধর্মী' রূপসনাতনকে
'ফকীর' উপাধি দিয়া পাক্তেয় করিল—

প্রেমের দেশে প্রেমের মানুষ,
জানে তারা আগম নিগম,
প্রেমুন তারা রূপ সনাতন,
ফকির হল ভাই দুজন।

(হারামণি, ৭৯)

পারস্যের সুফী গুরু জলাল উদ-দীন রুমীর প্রভাবই এই সাধকদের উপর সর্বাপেক্ষা
প্রসার পাইয়াছিল। মসনবীতে জলাল তোতা কাহিনীর অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন
তোতা মরার ভাগ করাতে মনীব তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল,
তাহাতে তাহার মুক্তি লাভ হইল। সেইরূপ মৃত্যু আসিবার পূর্বেই যদি মরার মত হইতে
পার তবেই তোমার ফানা, মোক্ষ। তাই রুমী বলিলেন গসসালের (মৃতদেহকে যাহারা
গোসল দেয়) হাতে মৃতের যে আচরণ তাহাই অভ্যাস কর। বাঙালী সুফী ঠিক সেই কথাই
বলিয়াছেন — জীবিতের বেশ তাজ (টুপি) ও তহবন্দ (লুঙ্গি) ত্যাগ করিয়া মৃতের বেশ
খিলফা-কাফন গ্রহণ কর, যেন গসসালের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছ —

মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়।।
যে জন জেল্লা লয় খেলকা কাফন
দিয়ে তার তাজ তহবন,
ভেক সাজায়।।

মরার আগে মলে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।।

(হারামণি, ৯)

দাদুও বলিয়াছেন,
দাদু মেরা বৈরী মৌ মুরা মুখে ন মারে কোই।

“হে দাদু, আমার বৈরি সেই 'আমি' মরিয়াছে, আমাকে কেহই পারে না মারিতে”।
(অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, দাদু, ১৩৪২, পৃ. ১০৯)

কবীরও বলিয়াছেন —

তজ অভিমানা সীখো জ্ঞানা
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ।।
কই কবির কোই বিরল হংসা
জীবত হী জো মরতা হৈ?

“অভিমান ত্যাগ কর, জ্ঞান শিক্ষা কর, সতগুরুর সঙ্গে এই সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কবীর কছেন, ‘জীবনের মধ্যেই মৃত্যুকে লাভ করিয়াছেন বিরল তেমন সাধক’।” (অধ্যক্ষ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, কবীর ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯)

সাধনা ও ধ্যানের ক্ষেত্র ব্যতীত লোক-সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলমানের অনুভূতি সম্মিলিত হইয়াছে। হাসান-হোসেনের শোকগাথায় কবি রামলক্ষণের অযোধ্যা ত্যাগের হৃদয়বিদারক দৃশ্য স্মরণ করাইয়া শ্রোতার সহানুভূতি জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন —

হানেফ বলে আয়রে কোলে জয়নাল বাছাধন
ওরে যেনা পথে দিছিরে দুই ভাই জোড়ের হোসেন হাসান
সেই না পথে যাবরে আমি করো আমার গোর কাফন।
রামলক্ষণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে,
এইরকম গেছেরে দুই-ভাই মদিনা শূন্য করে।

(হারামণি, ৮৯)

সাধনার গভীরতম সার্বজনীন সত্য ইহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উঠিয়াছে। নানাদেশের সাধু নানাকালে যে সত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন মনে হয়, ইহারা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহারই সন্ধান পাইয়াছেন। অন্তরতর হৃদয়মাঝা, উপনিষদের বাণী ইহাদের মুখে “মনের মানুষ” রূপে বাহির হইল - (রবীন্দ্রনাথ, ‘হারামণি’র আশীর্বাদ প.)

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।
আছে রয়ে, ডাকে তারে, উচ্চস্বরে কোন পাগলা;
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বোঝে থাক রে ভোলা।
যে জন দেখে সে রূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা,
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানান হরি কলা।

(হারামণি, ১)

তারে কেউ ধরিতে না পারে
সকল রঙ্গের মানুষ একটি থাকে মোর ঘরে।।
ঘরে থাকে বাইরে থাকে থাকে সে অন্তরে
তার লাগিয়া পাগল হইয়া হাসান রাজায় ফিরে।

রঙ্গ করে চণ্ড করে আরো করে খেলা
সেই মানুষে লাগাইয়াছে ভবান্বিতের মেলা।।
হাসান রাজা হইছে পাগল দেখিয়া তার লাগি,
তারে যদি ধরতে চাও রাত্রি থাকিয়ো জাগি।।

(হাছন উদাস, ১৩৮)

“সে দূরে নয়”, “সে দূরে নয়”, তাই শিরাজ লালনকে বলেন—
কে কথা কয়রে দেখা দেয় না, নড়ে চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনমভর মিলে না।
খুঁজি যারে আকাশ জমিন,
আমারে চিন না আমি
সে বড় বিধম ভ্রমের ভ্রমি,
সে কোন জন আমি কোন জন।।
হাতের কাছে হয় না খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর
সিরাজ কয় লালনরে তোর
তবুও মনের ঘোর গেল না।।

(হারামণি, ১৭)

তাহারই যেন স্পষ্ট প্রতিধ্বনি গ্যাটের
বারম ইন ডি ফেনে খুয়াইফেন
সী, ডাস গ্লুক লী গট সো না
(দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
শান্তি সে তো হাতের কাছে)

গুরু প্রশস্তিতে আবার হিন্দু-মুসলমানের ভক্তি স্তোত্র মিলিত হইয়াছে। ইরানি কবি হাফিজ বলিয়াছেন, “মুরশিদ যদি আদেশ দেন তবে আমি মদ দিয়া আমার জায়নামাজ

রাঙা করিব।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু কবি গাহিয়াছেন :

গুরু জগৎ উদ্ধার

আমারে কাঙাল জানিয়া পার কর।

রমনীর রূপ ধরিয়া গুরু, পুরুষের মন হর।

সর্প হইয়া দংশ তুমি, ওঝা হইয়া ঝাড়ো।

বুঝিতে না পারি তোমার মহিমা অপার ॥

ভেবে রাধারমণ বলে এই পারো, সেই পারো,

সকলেতে তরাইলায় গুরু, আমারে পার কর ॥

আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান কবি গাহিয়াছেন :

মুরশিদের চরণ সুধা পান করিলে যাবে ক্ষুধা

করো না দেখে দ্বিধা যেহি মুরশিদ, সেই খোদা

আপনি খোদা আপনি নবি, আপনি সে আদম হবি

অনন্তরূপ করে ধারণ, কে বোঝে তার নিরাকরণ

নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন মুরশিদ রূপ দেখে পথে।

(ম. দাশ, বসুমতি, ১৩৪১)

(১) উর্দুর মারফতে মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের চর্চা

মুসলমানেরা বাঙলা দেশে দেশজ ভাষার কাঠামো লইয়া উর্দু জাতীয় কোনও নূতন ভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহার প্রধান কারণ আরবী-ফারসী-বর্জিত তৎকালীন উর্দুর কাঠামো ও বাঙলার কাঠামোতে তফাৎ অতি অল্প ছিল অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান অনায়াসে সাধারণ উর্দু শিখিতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ তখনকার দিনের বাঙলা দেশের মুসলমান ঔপনিবেশিকদের অধিকাংশ ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী, তৃতীয়তঃ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল দিল্লী, রামপুরের আশেপাশে, সে সব জায়গায় মিডিয়ম অব ইনস্ট্রাকশন ছিল উর্দু।

কোন চেষ্টা হয় নাই বলা ভুল কারণ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বিস্তারিত ইসলামি ধর্মগ্রন্থ বাঙলাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলিতে আরবী ফারসী শব্দের প্রাধান্য। কিন্তু প্রধানতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য লিখিত বা গীত হইয়াছিল বলিয়া সেগুলি ঠিক

ইসলামি প্রতি, স্মৃতি বলা চলে না, তাহাদের ধারণা অনেকটা পৌরাণিক। নানাবাক্যে গল্পগাথাও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রসার পূর্ব বাঙলায় এখনও আছে।

আরেক চেষ্টা হইয়াছিল শ্রীহট্টাঞ্চলে। সে ভাষাকে 'সিলেটী নাগরী' বলা হয় ও এখন জীবন্তাবস্থায়। তাহার প্রধান লক্ষণ যে তার হরফ সৈবনাগরী নয়, বাঙলাও নয়, মাগধমাকি; ই-কার উ-কারে হ্রস্ব-দীর্ঘ নাই; ঔ-কার ঐ-কার নাই, এক শ-তে তিন শ-এর কাজ চালায়, অঙ্কায় য নাই, সংযুক্ত বর্ণ বিলকুল নাই, পাঁচ রকম অনুনাসিকের বাতাই নাই আর শব্দে ভাঙারে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু ও খাস সিলেটী শব্দের আন্তরিক দহরম মহরম।

কিন্তু এই সব চেষ্টার সঙ্গে মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলীর যোগাযোগ ছিল না— তাহার উর্দুর মারফতে শাস্ত্র চর্চায় মশগুল — তাই উর্দুজাতীয় কোন সবল ভাষার সৃষ্টি হইল না।

তাহার ফলে আজ বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতির ও শিক্ষার দৃষ্ট হইয়াছে। এ দৃষ্ট বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমান বলিতে আরবী, ফারসী, উর্দু শিক্ষিত মুসলমানকে বুঝাইত। তাহার শিক্ষা-দীক্ষায় কোনও দৃষ্ট ছিল না; তিনি বাঙলা জানিতেন না অথবা এত অল্প জানিতেন যে হিন্দু-চিন্তাধারা তাহার ইসলামি জগতে প্রবেশ করিত না। আরব, পারস্য, উত্তর ভারতবর্ষের ইসলামি চিন্তা ও ভাব জগতের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র ছিল।

বিংশ শতাব্দীতে কলহের সৃষ্টি হইল। হিন্দু সমাজেও এ কলহ ক্ষণস্থায়ীরূপে তাহার পূর্বে দেখা দিয়াছিল। সে যুগে পিতা ছিলেন ইংরাজি অনভিজ্ঞ খাঁটি হিন্দু, পুত্র ইংরাজি শিক্ষিত 'নাস্তিক'। পিতার পশ্চাতে হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য, পুত্রের পশ্চাতে মিল, ঈশ্বর আর ফারসী বিপ্লবের ইতিহাস। আজ পিতাপুত্র উভয়েই ইংরাজি শিক্ষায় গঠিত—কষ্টেস্টে হয়ত মেঘদূত পড়িতে পারেন—আর পণ্ডিত হইলেও ভেনিস স্টেশনে মূর্খা খান ও জান মদ্য 'খাদ্য' হিসাবে গ্রহণ করেন; কলহের অবসান হইয়াছে। নিকম্বর হায়াত বাঙলা দেশে আসিয়া উর্দুতে বক্তৃতা দেন, দাওয়াতে খানা-পিনাতে উর্দু বলেন, ফারসী ব্যোত খাড়েন, আরবী কোটেশন চৌকেন, তাহাদের সঙ্গে মৌলানা আকরম অক্লেশে কথা বলেন, কলিকাতার দূই একজন ঔপনিবেশিক উর্দু বলিয়া লজ্জা রফা করেন কিন্তু কলেজে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান নেতা তখন ভাষণ না করিয়া শোভা পাইবার চেষ্টা করেন। যদি বা কষ্টেস্টে কথার স্রোত ঘুরাইয়া ইংরাজি জমির উপর নিয়ন্ত্রণ চালান তখন গয়া পড়ে মুসলমান কৃষ্টিতে তাহার অভ্যভেদী, পাতালস্পর্শী অজ্ঞতা। বীরের তুলনা দিতে গেলে তাহার মনে পড়ে ভীষ্মার্জুন, প্রেমিক-প্রেমিকার কথা বলিতে গেলে সাধাক্ষ, দার্শনিকের নাম করিতে শঙ্কর-রামানুজ। হাসন-হোসেন, লায়লী-মজনু, ইবনি, সিনা-

গজালীর নাম শুনিয়াছেন-পরিচয় নাই। ব্যাপার আরও মর্মস্পর্শ হয় এই বাঙালী মুসলমান নেতারই পলিটিক্স-ইকনমিক্স-সোসিওলজি-লীগ-কংগ্রেস অনভিজ্ঞ “ওল্ডফেশনড” পিতা যখন মজলিশে উপস্থিত হইয়া অক্লেশে উর্দু বলেন, সিকন্দরের ব্যয়েত শুনিয়া “শাবাশ” বলেন, কায়দা মাফিক উলটা ব্যয়েত ঝাড়েন।

উর্দু বলিতে পারা বাঙালী মুসলমানের চরম মোক্ষ নহে। উর্দু না বলিয়াও মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখা সম্ভব; যেমন আজ সংস্কৃত না জানিয়াও হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে মোটামুটি সম্বন্ধ রক্ষা করা যায়। সংস্কৃতে লিখিত হিন্দু সভ্যতার প্রায় সব প্রধান গ্রন্থ বাঙলাতে তর্জমা হইয়াছে, বিস্তর টিকাটিপ্পনী ও নূতন কেতাব লেখা হইয়াছে। ‘বসুমতি’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘প্রবাসী’র পিয়েস দ্য রেজিজসর্ভাস এখনও গুরুগম্ভীর বৈষ্ণবতত্ত্ব, তাত্ত্বিক মতবাদ বা উপনিষদের জ্যোতির্ময় পুরুষ। এ সমস্ত বাঙালী হিন্দুর মাতৃভাষায় লেখা, তাহার সঙ্গে পরিচয় থাকিলে সে অনারাসে পূনাতে হিন্দুমণ্ডলীর ভিতরে বসিতে পারে—যদিও তাহার পক্ষে সেখানে সংস্কৃত উচ্চারণ না করাই প্রশস্ত। কিন্তু বাঙলাতে মুসলমানদের সেরকম কিছু নাই।

সংস্কৃতির এই ক্ষেত্রে যে শুধু বাঙালী মুসলমানই দিশাহারা হইয়াছে তাহা নহে—উত্তর ভারতবর্ষের উর্দু ভাষাভাষী হিন্দুরাও এই বিপদে সমগোত্র। তেজবাহাদুর কিসনের বানসারী মাদ্রাই শুনিয়াছেন, জহর লাল বৃহৎ তবলীফ করিয়া হিন্দী লেখা মকশো করিয়াছেন কিন্তু পিতা মোতিলাল এসেমব্লিতে গালাগাল দিতেও “মন তুরা হাজী মীণুম তুমরা কাজী রগো” বলিয়াছেন। ইহাদের সমস্যার কিন্তু সমাধান আছে, উর্দু না শিখিয়া হিন্দী শিখিলেই বাঙালী হিন্দুর মত হিন্দু সংস্কৃতির সহিত সংযুক্ত হইবেন।

কিন্তু বাঙালী মুসলমান যায় কোথায়?

উত্তর হইতে পারে—

(১) হিন্দু মুসলমান দুই সংস্কৃতি বাদ দিয়া শিক্ষা লাভ করো; উত্তরে নীচশে সাহেব বলিয়াছেন “নেমট নুর ডি শ্রীয়েন, সামট ডের ফিলোসফী উনট ডের কুনস্ট বেব: অন বেলধের লইটর বলট দ্বির নখ তসুর বিলডুনক এমপর ষ্টাইগেন?” টিপ্পনী অনাবশ্যক, দুই মই-ই যদি কাড়িয়া লওয়া হয় তবে বাঙালী মুসলমান চড়িবে কোথায়।

দ্বিতীয় উত্তর হইতে পারে বাঙলার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া উর্দু শিখা। কিন্তু সে অসম্ভব। যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের উর্দু হিন্দীর ন্যায় বাঙলাদেশে উর্দু বাঙলার নূতন সমস্যা সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

তৃতীয় উত্তর হইতে পারে বাঙলাতে মুসলমান সংস্কৃতির আলোচনা ও সাহিত্য সৃষ্টি—হিন্দুরা যেরূপ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা বাঙলাতে গত একশত বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য অত্যধিক বাক্যব্যয় না করিলেও চলিবে। মাতৃভাষাতে ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনা না করার বিষময় ফলের চমৎকার দৃষ্টান্ত পশ্চিম ভারতবর্ষের পার্সী সমাজ। মাতৃভাষা তাহাদের গুজরাতি। অধিকাংশ পার্সীই মাতৃভাষা ভালো করিয়া জানে না ও গুজরাতিতে পার্সী ধর্ম ও সংস্কৃতির পুস্তক সংখ্যা নগণ্য। ফলে পার্সীরা সংস্কৃতিহীন—অনুকরণশীল।

মুসলমানি যুগে তাহারা মোগলাই খানা খইয়াছে, ফারসী ভাষা শিখিয়াছে, কিন্তু কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করে নাই। গত একশত বৎসর ধরিয়া তাহারা ইংরাজি কায়দায় উঠে বসে ও খাঁটি অকস্ফোর্ডী উচ্চারণ করিতে পারা চরম মোক্ষ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে ধর্মে সঙ্কীর্ণতা এবং তাহার প্রধান কারণ ধর্মালোচনার সুবিধা মাতৃভাষাতে নাই বলিয়া। পার্সী বাল্যকাল হইতেই ধর্ম বলিতে বোঝা কয়েকটি ক্রিয়াকণ্ড। হিন্দুর মত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের আদর্শ ও ভাগের আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠে না। এই অজ্ঞতাই তাহাকে ধর্মের রাজ্যে অন্ধ করিয়া তোলে—ভাবে যাহা জানা নাই তাহা চক্ষু বন্ধ করিয়া মানিয়া লওয়াই প্রশস্ত। তাই সেদিন যখন এক পার্সীর উইলের কথা জানাজানি হইয়া গেল যে তিনি মৃত্যুর পরে যেন তাহার দেহ টাওয়ার অব সায়েন্সে না রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন তখন তামাম পার্সী সমাজ হক্কার দিয়া উঠিল—তাহার নাপিত-খোপা বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিবেশী ইসমাইলীয়া শীয়া বোহরা সমাজেরও এই অবস্থা। জাতে মুসলমান, মাতৃভাষা গুজরাতি, সে ভাষাতে মুসলমানী কিছু নাই। তাহাদের মত ধর্মে অজ্ঞ ও তাহারই ফলস্বরূপ ধর্মে অন্ধ জাতি পৃথিবীতে কম। আরবীতে লেখা তাহাদের বহু প্রাচীন ধর্ম পুস্তক ‘মোটা-মোল্লাজী’র বাড়ীতে পোকায় কাটিতেছে। ইংরাজি ও আরবী শিক্ষিত এক বোহরা যুবক তাহারই একখানি মুদ্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভদ্রলোকের নাকের উপর সমাজ তাহার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে এ সাহিত্য রচনা করিবে কে? বাঁহারা ভালো বাঙলা জানেন তাঁহারা ইসলাম চিনেন না, বাঁহারা ইসলামের পূর্ণ সংস্কৃতির খবর রাখেন তাঁহারা বাঙলা জানেন না। কাজেই এই ব্যাপক সাহিত্য একদিনে গড়িয়া উঠিতে পারে না—বহু লেখকের, বহু দিবসের, বহু তপস্যার প্রয়োজন। এইসব লেখকেরা নির্মাণ করিব কি করিয়া? শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া—অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানকে সনাতন বাঙলা শিখিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের পূর্ণ সংস্কৃতির সহিত পরিচিতি হইতে হইবে। কেহ কেহ

হয়ত আপত্তি জানাইয়া বলিবেন 'শিক্ষা দ্বিখণ্ডিত হইবে'। তাহাতেও ভীত হইবার কারণ নাই—সুইজারল্যান্ডে (ও নাৎসি অবতরণের পূর্বে জার্মানিতেও এখনও কিয়ৎ পরিমাণে) বহু বালকবালিকা প্রটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের জন্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্কুলে যায়। দুই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন এক, শুধু ধর্মশিক্ষা স্বতন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্যাথলিক থিয়লজি ও প্রটেষ্ট্যান্ট থিয়লজির দুই বিভাগ। সেখানে শুধু ধর্ম শিক্ষা হয় না, ছাত্রেরা ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট স্ব স্ব সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয়। অথচ পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে এমন কোন বিভেদ এযাবৎ হয় নাই যাহার জন্য এ শিক্ষা নিষাদ্য কারণ হইয়াছে। তর্ক উঠিতে পারে, দৃষ্টান্তটি ঠিক হইল না কারণ প্রটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পার্থক্য হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য অপেক্ষা কম। সত্য আজ কম কিন্তু মধ্যযুগে এই দুই সম্প্রদায় শুধু ধর্মের জন্য যে রক্তারক্তি করিয়াছে ভারতবর্ষে সেইরূপ তাণ্ডব নৃত্য কখনও হয় নাই; অথচ শিক্ষার দিক দিয়া আমরা তো এখনও মধ্যযুগে।

আমাদের বক্তব্য এই, মুসলমানকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে অঙ্ক রাখিলে ক্রমে ক্রমে সে উদার হইবে এ আশা দুরাশা। সে তাহার ধর্ম ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পুষ্ট হউক, বাড়লা সাহিত্য ও হিন্দু কৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত থাকুক, তবেই সে উদার হইবে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে অগ্রসর হইবে।

ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে; প্রত্যেক জাতি আপন বাতি উচু করিয়া ধরিলে এই উৎসব সমাধা হইবে।



হাসন রাজা

নিম্নবর্ণের ইতিহাস

রঞ্জিত ওহ

ইতিহাস বিদ্যার সংকট ও উচ্চবর্ণের ইতিহাস

আমরা ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আছি। আমার নিজের পড়াশুনার মূল বিষয় ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ। তাই ইতিহাসবিদ্যা বলতে আমি বোঝাবো সেই স্মৃতি বা প্রতীতির কথা যার বিশদ প্রকাশ ওই যুগ প্রসঙ্গে আমাদের মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যে। এই ইতিহাসবিদ্যার যে কর্তা তার চৈতন্যের বিশিষ্ট রূপটির নাম হিসেবে আমি ইতিহাসচেতনা শব্দটাও কখনো কখনো ব্যবহার করব। আর সংকট বলতে আমি বোঝাতে চাই সেই বিশেষ অবস্থা যখন কোনো জ্ঞানমার্গে অগ্রগতির তাগিদ—যার উৎস সমাজের প্রয়োজনে বা ব্যক্তি প্রতিভায় বা উভয়ের সমন্বয়ে—যখন সেই তাগিদ ওই জ্ঞানমার্গের তত্ত্ব বা অভ্যাসের পুঞ্জ দিয়ে আর মেটানো যাচ্ছে না। এই অর্থেই ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আমরা আছি।

এই সংকটের একটি প্রধান লক্ষণ আজ আমার আলোচনার বিষয়। কিন্তু সেই বিচারের ভূমিকা হিসেবে আমি এই ইতিহাসবিদ্যার ইতিহাস সম্পর্কে দু'য়েকটি কথা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। আমরা যে ইতিহাস লিখি, পড়ি ও পড়াই তার উৎপত্তি ইংরেজের ক্ষমতালিজায়। পলাশীর যুদ্ধের আগেও আমাদের ইতিহাস লেখা হত। কিন্তু সে ইতিহাসের শীট ছিল পৌরাণিক অর্থাৎ যেখানে ঐহিক ঘটনা ও সম্পর্কগুলিকে দেখা হত পারমিতিক ঘটনা ও সম্পর্কের ক্ষণিক ও একান্তই গৌণ প্রতিভাস হিসেবে—যেমন ধরন, কালকেন্দ্র, পাতকের জীবন একান্ত বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাতন্ত্র্য নেই; তার জীবন নীলাধরের পূর্ণাঙ্গতার ইতিহাসের এবং তাও আবার পার্বতীর অলৌকিক জীবনী এবং তাঁর পূজার ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র—যেন বন্ধনীর মধ্যে বন্ধনী, বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত। অবশ্য ঐহিক ইতিহাসের ধারাও ব্রিটিশ রাজত্বের আগে চালু ছিল। আরবি-ফারসি ইতিহাসবিদ্যার ঐহিকতার সূত্রে পাওয়া এবং মুঘল বাদশাহের বা তাঁদেরই সমকালীন ছোটবড়মাফারী-না-সমস্ত ভূস্বামীদের আশ্রিত এই ধারাটির উপজীব্য ছিল এক কথায় যাকে বলা যায়

রাজকাহিনী। কাহিনীর নায়করা কখনো দিল্লীশ্বর, কখনো বা কোনো আঞ্চলিক ক্ষুদ্র স্বশ্র—
কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে তারা সকলেই জগদীশ্বর। তাদের বংশাবলী, দিগ্বিজয় ইত্যাদি
ছাড়াও শাসনব্যবস্থা, রাজত্বের হার, ভৌগলিক তথ্য এবং শুই ধরনের আরও কিছু
সাম্প্রতিকতার ছাপ এই জাতীয় ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু প্রভুর জীবনই যেহেতু প্রজা
ও রাষ্ট্রের জীবনের একমাত্র প্রতিভূ, তাঁর প্রতিভা ও কীর্তির ছটায় উজ্জ্বল অথচ সংকীর্ণ
ক্ষেত্রটির বাইরে সবটাই অন্ধকার ছিল। তাছাড়া আরো একটা কথা ভাবতে হবে।
রাজারাজ্যের নামাক্ষিত এই রচনাগুলিকে কি সত্যিই ইতিহাস বলা যায়? এগুলি
সমসাময়িক ও আঞ্চলিক তথ্যের আকর সন্দেশ নেই। কিন্তু অতীতকাল সম্পর্কে
পরিপ্রেক্ষিতের যে গভীরতা ইতিহাসবিদ্যার প্রধান লক্ষণ তার অভাব এ রচনায় তো খুবই
স্পষ্ট। আসলে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এইসব রচনা যখনই নেহাৎ সাম্প্রতিকতা বা
বর্তমানেরই একান্ত গা-ঘেঁষা অদূরবর্তী অতীতের আওতা ছাড়িয়ে যায় তখনই তার
মধ্যে হয় পৌরাণিক ধরনের অলৌকিকতা এসে পড়ে কিংবা সেই অতীতের গভীরতা
কেবলমাত্র সন-তারিখের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে ইতিহাসকে পরিণত করে বর্ষপঞ্জিতে।

কিন্তু যে ইতিহাসচৈতন্য অতীতকাল শুধু চক্রাকারে ঘোরে কিংবা যার বহুতা শুধু
সামন্ত শাসকদের অগভীর জীবনযাত্রার খাতেই সীমাবদ্ধ তা দিয়ে বাণিজ্য-ধনবাদ থেকে
শিল্পাশ্রয়ী ধনতন্ত্রে উত্তরণের যুগে কিংবা আরো পরিণত ধনতন্ত্রের যুগে ঔপনিবেশিক
রাজ্য শাসনের কাজ চালানো যায় না। কারণ সেই শাসনের বাস্তব ভিত্তি ভারত ভূখণ্ডের
যে পণ্য বা কাঁচামাল রপ্তানি করা ও যন্ত্রস্থ করা তার শর্তই হল আরেক ধরনের সময়—
যে সময় সরলরেখায় চলে, যা দিয়ে সওদাগরি হাওয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ছন্দ
মেলানো হয় ঔপনিবেশিক যুগের আদিপর্বে, যে-সময়ের কঁটায় কঁটায় ল্যাংকাশায়ারের
সূতাকলের বাঁশি বাজে, মেশিন চলে এবং দুনিয়ার প্রথম যন্ত্রসভ্যতায় যে-সময়ের সঙ্গে
শিল্প, পুঁজি ও শ্রমের সংগত থেকেই সৃষ্টি হয় এক নতুন ধরনের সময়-কল্পনা যার নাম
মেহনতি-সময়।

সময়ের এই নতুন ধারণা যে-ইতিহাসবিদ্যার প্রাণশক্তি, ইংরেজ এদেশে আসার ফলে
তা আমাদের চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হল। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ভারতে
আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার শুধু ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন থেকে নয়, ইংরেজ শাসনব্যবস্থা
থেকে—এবং সেই শাসনব্যবস্থা, কলাই বাছল্য, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চেষ্টাও পুরনো।
কথাটা একটু জোর দিয়ে বলতে চাই, কারণ একটা কুসংস্কার একসময় চালু ছিল এবং

এখানে হয়ত আছে এই মর্মে যে ইংরেজরা পাশ্চাত্য সভ্যতার উদার আদর্শে আমাদের
দ্রোণিত করার জন্য যে-সব বিদ্যায় উৎসাহ দিয়েছিল ইতিহাসবিদ্যাটাও তার অন্যতম।
কিন্তু যে একেবারেই ভুল তা কোম্পানির আদিপর্বের নথিপত্র ঘাঁটলেই বোঝা যায়।
কারণ পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরেই যখন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হবার
সম্ভাবনা দেখা দিল—সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি হয়ত ১৭৬৫ সাল যখন কোম্পানি দেওয়ানি
হাতে পেল কিংবা তারও কিছু আগে যখন নবাব তিনটে জেলা ('Ceded Districts')
তাদের দিয়ে দিলেন—তখন থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরেজ শাসনের হাতিয়ার
হল। কারণ লুণ্ঠপাটাই যেখানে দেশজয়ের উদ্দেশ্য সেখানে ইতিহাস অবাস্তব। গোয়া বা
দিব্লির অতীত (বা ভবিষ্যৎ) নিয়ে আলবুকার্ক বা নাদির শাহ-র মাথা ঘামানোর দরকার
ছিল না। লুণ্ঠীর কাছে বর্তমানটাই একমাত্র সত্য। কিন্তু জয় যখন বিজিত দেশে ক্ষমতা
পায়েম করার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, বিজিতাকে তখনই ইতিহাসচৈতন্য ব্যবহার করতে
হয়। প্রভুসংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান হিসেবে। সব বিজিতার পক্ষেই একথা খাটে,
ওবে অবস্থা ভেলে ঐ চৈতন্যের বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যে।

অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও উপনিবেশের পঙ্কন হয়েছিল পাশ্চাত্য শক্তির
অগ্রবলের সাহায্যে কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই এদেশের সেই শিশুরাষ্ট্র তার স্বকীয়
ভঙ্গিতে বেড়ে ওঠে। এই স্বকীয়তার নানা দিক ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই
সেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস যা অনেকখানিই এখনো গবেষণার বিষয় বলে
গণ্য হতে বাকি। বর্তমান প্রসঙ্গে তার শুধু একটি দিকই লক্ষ্য করতে বলি। তা হল এই
যে কোম্পানির আমলের প্রথম পর্বে তার সেনাবলের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে
ভূমিরাজস্ব এবং দেওয়ানি বিচার সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রই এদেশে ঔপনিবেশিক
রাষ্ট্রের মুখ্য অবয়ব হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই অবয়বটি যেমন ইংরেজ রাজশক্তির
প্রকাশকে দ্বারাঙ্কিত করে তেমনি আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সূচনা এরই মাধ্যমে। কারণ
আগেই বলেছি যে এদেশে পাশ্চাত্য ইতিহাসচৈতন্যকে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল
সেনাবলের আদর্শের উৎসাহে নয়, রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ও তাগিদে। দেওয়ানি হাতে
নায়েই ইংরেজ টের পায় যে এদেশে কৃষিব্যবস্থা অতি প্রাচীন, জমির সঙ্গে রাজা-প্রজার
সম্পর্ক এখানে নানা সনাতন প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং জমির মালিকানা, ফসলবোনার
স্বত্ব ইত্যাদি সবকিছুই এক সাবেক সংস্কারের অঙ্গ। অতীতকে উপেক্ষা করে এখানে
গাঢ় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই সে যুগের সরকারি কাগজপত্রে ঐতিহাসিক বিবৃতির
খণ্ড খণ্ড নেই। যারা লাঙ্গলদ্বিধি ও গোলদ্বিধি পাড়ায় নথিখানার ধুলো ঘেঁটেছেন তাঁরা সকলেই

জানেন এইসব বিবৃতি কত অমূল্য তথ্যে ভরা কত বিচিত্র বিষয়ে সমৃদ্ধ। প্রাক-ব্রিটিশ, বিশেষ করে মুঘল আমলের রাজশাসন, ভূসম্পত্তির অধিকার, কৃষিব্যবস্থা, বাণিজ্যব্যাপার ইত্যাদি, সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহু প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এইসব সরকারি কাগজপত্রে হামেশাই পাওয়া যায়। কেউ যদি বলেন যে এগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের আকরমাত্র কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস নয়, তাহলে অবিচার হবে। যদিও সদ্য প্রকাশিত সবচেয়ে আনকোরা বইটি বা প্রবন্ধটির তুলনায় এগুলি হয়ত একটু কম পরিপাটি মনে হতে পারে, তবু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা এইসব রচনায় তথ্য ও যুক্তির সমন্বয় এবং কার্যকারণ সূত্রে সাজানো বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার প্রধান গুণগুলি সবই বর্তমান। তবে যে বিশেষ অবস্থায় এই ইতিহাসবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছিল তার ফলে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ—বলা যায় জন্মলক্ষণ—প্রথম থেকেই চোখে পড়ে। তার মধ্যে গুটিনুয়েক বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম লক্ষণটি এই যে এই ইতিহাসবিদ্যার জন্ম এদেশে ইংরেজ রাজশক্তির ঔরসে এবং ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তা ঔপনিবেশিক শাসনদণ্ড আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। যারা এই ধারায় প্রথম ইতিহাস লেখেন তাঁরা সকলেই হয় সরকারি কর্মচারী কিংবা সরকারের প্রসাদপুষ্ট ও ইংরেজ শাসনের সমর্থক বেসরকারি সাহেব মেমসাহেব। তাঁরা যে ইতিহাস লেখেন তার উদ্দেশ্য হয় একেবারে সরাসরি শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন সিদ্ধ করা কিংবা বেসরকারি রচনা হলেও কার্যত তার সাহায্যে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি ও প্রভুসংস্কৃতিকে আরো জোরদার করা। এমনকি এইসব লেখকরা যখন অতীত বিষয়ক বক্তব্যগুলি রিপোর্ট, মিনিটস বা ঐ জাতীয় সরকারি নথি হিসেবে না লিখে নিছক ইতিহাস হিসেবেই লেখেন তখনো বিজ্ঞতা ও শাসকের দৃষ্টির কাছে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সংকুচিত হয়। উইলিয়ম হাক্টারের মত প্রতিভাবান এবং উদারচেতা ব্যক্তিও এইরকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে নন।

ইতিহাসচিন্তনায় ঔপনিবেশিক মানসিকতার এই প্রভাব ইতিহাসবিদ্যার চরিত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। ইওরোপে বুর্জোয়াদের অভ্যুদয়ের সময় এই বিদ্যা তদানীন্তন সমাজে সামন্তশ্রেণির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের নির্মম সামালোচনায় ব্যাপ্ত ছিল। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে আলোকপ্রাপ্তির যুগ থেকে সেই সমালোচনা সামন্তশক্তির তিন প্রধান অর্থাৎ রাজা, জমিদার ও পুরোহিতের অধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে ১৭৮৯ সালের ঐতিহাসিক জয়ের পথ প্রশস্ত করে।

অথচ দেখুন ঐ ইতিহাসবিদ্যাই যখন একটি পাশ্চাত্য বুর্জোয়া শক্তির মাধ্যমে এদেশে ঔপনিবেশ গড়ার কাজে ব্যবহৃত হল তখনই তার ভূমিকা পালটে গেল, এমনকি বলা যায় উল্টো গেল। কারণ যদিও তা ফরাসি বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং তারই পরিণতি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে, ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাই হয়ে দাঁড়াল জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় ইংরেজ শাসনের অনুকূল। অর্থাৎ সে আর তখন প্রভুশক্তির সমালোচক নয়, নতুন ভূমিকায় সে প্রভুশক্তির স্তাবক।

এই ইতিহাসবিদ্যার আরেকটি জন্মলক্ষণ হচ্ছে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব শাসকদেরই মনোভাবের প্রতিফলন। কারণ ইংরেজদের রাজত্ব যখন শুরু হয় তখন আমাদের সমাজের রীতিনীতি ভাষা ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে সাড়ে পনেরো আনাই তাদের অজানা ছিল। এরকম একটা অপরিচিত দেশে তার কৃষিব্যবস্থা ও মালিকানার সনাতন ও জটিল রহস্য ভেদ করে সেখান থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করাও সেই বিদেশি রাজশক্তির পক্ষে তখন শক্ত কাজ। তবে আঠারো শতকের ব্রিটিশ সমাজের আদর্শ অনুযায়ী কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ধারণা হয় যে এদেশেও সমাজের প্রধান স্তম্ভ সেইসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা বেশ বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তির মালিক, এবং তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলেই রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনের সমস্যা মিটে যাবে। এইসব তথাকথিত natural leaders বা স্বভাবনেতাদের খুঁজে বার করা, তাদের স্বত্ব অধিকার ইত্যাদির সংজ্ঞা ও সীমা নির্ণয়, এবং তাদের পাওনাগুণার হিসেব নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা সরকারি কাগজপত্রে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। এরই ফলে এতদ্দেশীয় উচ্চবর্গের স্বার্থ ও সুবিধা একইসঙ্গে স্বীকৃতি পায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিতে এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ্যায়। ইতিহাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে এই উচ্চবর্গের স্থান তখন ইংরেজের ঠিক পরেই। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সামন্তবংশের উত্তরাধিকারী, অনেকে আবার জমিদারি বা অন্য নামে হলেও কার্যত জমিদারি বন্দোবস্তের কল্যাণে কায়েম নয়া-সামন্তশ্রেণির প্রতীক। এরই স্বভাবনেতার মর্মানী পেল ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন আইনকানুনের ফলে। আর ঠিক এইভাবেই পাশ্চাত্যে যে ইতিহাসবিদ্যা সামন্তবাদের বিরোধিতায় সক্রিয় ছিল, ঔপনিবেশিক অবস্থায় সে তার মূল চরিত্র পালটে পরিণত হল পরশ্রমলব্ধ ফসলের উদ্ধৃতি পুষ্ট এক নয়া-সামন্তশ্রেণির অনুকূল জ্ঞানকাণ্ডে। ইতিহাসকে এই শ্রেণির সপক্ষে ওকাগতির ভূমিকার নামাবার জন্যে কতদূর যাওয়া

সম্ভব তা যাঁরা ফ্রান্সিস, শোর ও কর্ণওয়ালিসের মিনিটগুলির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন।

যে দুটি জন্মলক্ষণ বর্ণনা করা হল তা একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে আঠারো শতকের যে ইতিহাসবিদ্যা ইংরেজের ক্ষমতালিপ্সার ফলে একটা ঔপনিবেশিক বিদ্যায় পরিণত হয়েছিল ভারতের বিশেষ অবস্থায়, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তার ঝাঁক ছিল উচ্চবর্ণের সপক্ষে।

আমরা যে ইতিহাস লিখি পড়ি পড়াই বা অন্যথা চর্চা করে থাকি তার প্রেরণা সবটাই সেই ইতিহাসবিদ্যার আদিকল্প থেকে পাওয়া। টমাস কুন্স দেখিয়েছেন যে জীববিদ্যা রসায়নবিদ্যা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে এক-একটি আদিকল্পকে আশ্রয় করে। তারই ভিত্তিতে এক-একটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বা ঘরানা গড়ে ওঠে, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিন্তা ও পরীক্ষা চলে তার আদর্শে রচিত নানা মডেল বা প্রতিকল্পকে কেন্দ্র করে, সেইসব চিন্তা ও পরীক্ষার ফল আবার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যথা—ইনস্টিটিউট, লেবরেটরি, ইউনিভার্সিটি, ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি) উদ্যোগে এবং পত্রপত্রিকা, পাঠ্যবই, নানা ধরনের তালিমী-কেতাবের মাধ্যমে ওই আদিকল্পটিকেই প্রচার করে বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিশেষজ্ঞ ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে। তারপর কিন্তু একটা সময় আসে যখন তত্ত্ব ও প্রয়োগে এইসব আন্দোলনের ফলেই সেই একই বিদ্যার ক্ষেত্রে এমন সব নতুন প্রশ্ন ওঠে বা সমস্যা আবিস্কৃত হয় যার উত্তর বা সমাধান আর প্রতিষ্ঠিত, সর্বসম্মত আদিকল্পটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তখনই সেই পুরনো আদিকল্পে সংকট ঘটে; প্রগতির দাবি মেটাতে পারে না বলেই তার প্রভাব ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন প্রশ্নগুলির উত্তর বা উত্তরখোঁজার পক্ষে অনুকূল আরেক শক্তিশালী নতুন আদিকল্প তার অগ্রজকে হঠিয়ে দিয়ে নেকৃত্বের ভূমিকায় নামে বিজ্ঞানের সেই বিশেষ শাখায়।

বিজ্ঞানে শুধু নয়, যে কোন জ্ঞানকাণ্ডেই অগ্রগতির পথ এইভাবে তার আদিকল্পগুলির আয়ুষ্কাল দিয়ে মাপা যায়। ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যে-ইতিহাসবিদ্যার সাহায্যে আমরা ঔপনিবেশিক যুগের অতীতকে বুঝতে বা বোঝাতে অভ্যস্ত তারও প্রেরণা আঠারো শতকের ইউরোপ থেকে নেওয়া এবং পরাধীন ভারতের বিশেষ অবস্থায় ঢেলে-সাজানো একটা প্রৌঢ় আদিকল্প। ইতিহাসবিদ্যার সংকট বলতে আমি সেই আদিকল্পের সংকটের কথাই বোঝাচ্ছি।

আগেই বলেছি যে এই আদিকল্পটি প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে ইতিহাসবিদ্যার চালিকা শক্তি আরেক আদিকল্পকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করেছিল, আর তখন থেকেই ইতিহাসচেতনা পৌরাণিক কল্পনার স্বর্ণ ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে এবং অলৌকিক সময়ের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে ঐহিক সময়ের সহজ রাস্তায় পা চালাবার সুযোগ পায়। ফলেই অতীত ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও বাস্তব জীবনের নানা অজানা দিক তখন উদ্ভাসিত হয়েছিল ইতিহাসের আলোকে। এটা যে একটা মস্ত বড় লাভ তা অস্বীকার করার কোন মানে হয় না। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে উচ্চবর্ণের ইতিহাস সম্পর্কে যে পক্ষপাতিত্ব প্রাক্তন আদিকল্পটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, নতুনটিতে তার কোন ব্যতিক্রম হল না। শুধু আগে যেখানে ঠাকুরদেবতা ও রাজারাজড়ার লীলাকেই ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু বলে মনে করা হত, এখন তারই বদলে ইতিহাসের পাতা জুড়ে বসল ইংরেজের মাহাত্ম্য ও ইংরেজশাসিত সমাজে বাদের টাকা জমি জাত পেশা বা চাকরির জোর বেশি তাদেরই মাহাত্ম্য। এই মুষ্টিমেয়ের ইতিহাসকেই চালানো হল এবং এখনো চালানো হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে।

উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী এই আদিকল্পের প্রভাব ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে চিন্তায় ও লেখায় এতই পরিষ্কার যে সে বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য নয় শুধু এইজন্যই যে ঝোঁকটা প্রায় সর্বব্যাপী সুতরাং অতিরেকের বশে সচরাচর চোখে পড়ে না বলেই ধরে নেওয়া হয় ওটা যেন অবিসংবাদী সত্য, যেন তা অতীতের সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাটির ধ্রুবগুণগুলির অন্যতম। অথচ ঝোঁকটা ঠিক এইরকম হবার ফলেই ওই অভিজ্ঞতা তার জোর জটিলতা ও ঘনত্ব অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ইংরেজ আমলের রাজনৈতিক জীবন, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের সমস্যা নিয়ে যে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে, উদাহরণস্বরূপ তার কথা আলোচনা করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

এই সাহিত্যের প্রায় সবটাই দুটি প্রতিকল্পকে আশ্রয় করে লেখা। দুটিই উচ্চবর্ণের দৃষ্টিভঙ্গির বাহন। উভয়েরই প্রতিপাদ্য এই যে সে যুগের রাজনীতি বলতে প্রধানত, এমনকি কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও কর্মকাণ্ডকেই বোঝায়; এবং জাতীয়তাবাদ সেই রাজনীতিরই অন্যতম, এমনকি মুখ্য প্রকাশ। তবে মৌলিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে অভিন্ন নয়। কারণ উচ্চবর্ণের যে অগ্রণী শক্তিগুলির তারা প্রবক্তা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও উপায়ে

পার্থক্য, এমনকি অবস্থাবিশেষে স্বল্পও কখনো কখনো দেখা দিত। এই মৌলিক সাদৃশ্য এবং সৌপাৰ্শ্বিক কিছু কিছু বিরোধিতার সমন্বয়ের জন্যই উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী চিন্তাধারা দুটি ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েও তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে।

প্রথম ধারাটির বৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি এবং তারই সহায় ও ফলগত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচার করা। এই ধরনের ইতিহাসের চর্চা ও প্রচার হত এবং এখনো হয়ে থাকে ব্রিটিশ লেখক ও বিন্যাসনগুলিরই মাধ্যমে; তবে অন্যান্য দেশে, এমনকি এদেশেও তার অনুকারীর সংখ্যা কম নয়।

এই ধারাটির মূল কথা হচ্ছে এই যে ভারতবাসীর একজাতীয়তা বলতে যা বোঝায় তার রক্তসংগঠন ও চেতনারূপ ইংরেজ শাসন, তৎসংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন শাসকের ও সমষ্টিগতভাবে শাসকগোষ্ঠীরই প্রতিভার ফল। এক ধরনের সংকীর্ণ ব্যবহারবাদী চিন্তায় যেমন সব কিছুই ব্যাখ্যা করা হয় প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়ার খেলা হিসেবে, ইতিহাসবিদ্যার এই ধারাটিতেও জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে তা শুধু রাজশক্তির প্রয়োজনে সৃষ্ট সুযোগসুবিধা শিক্ষাদীক্ষা আইনকানুন ইমুল-আদালত ইত্যাদির প্রেরণায় উৎসাহিত ভারতীয় উচ্চবর্ণের আচরণ ও মনোভাবের সমষ্টিমাত্র। এই ব্যাখ্যাটির এক সাবেক সংস্করণে ইংরেজের আমদানি লিবারল সংস্কৃতিকেই জাতীয়তাবাদের প্রধান কারণ বলে গণ্য করা হত। তবে এখন সেই দা-কাটা বক্তব্যকে আরো একটু পালিশ করে দেখানো হচ্ছে যে কজনকে বি-এ ডিগ্রি দেওয়া হল শুধু তারই ওপর জাতীয়তার প্রসার নির্ভর করে না, ওটা আরেকরকম শিক্ষাপ্রণালী বা learning process-এর ফল। এই প্রণালীটি সম্পর্কে ব্যবহারবাদীরা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে খাবারের লোভ দেখালে ইদুরের মত জন্তুকেও শিক্ষিত করে তোলা যায়। একটা খাঁচার মধ্যে জটিল ধাঁধার মত চলাচলের পথ বানিয়ে তার কোন দুর্গম অংশে একখণ্ড পনির রেখে দিন। তারপর একটা সাদা ইদুর ছেড়ে দিন খাঁচার মধ্যে। কৃষ্ণের জীবটি অবশ্য দুয়েকবার রাস্তা হারিয়ে ফেলবে, ভুল করবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন গোলকধাঁধার প্যাঁচগুলি বহু চেষ্টায় রপ্ত করে সে ঠিক বুঝে নিয়েছে কেমনভাবে ওই খাদ্যবস্তুর কাছে পৌঁছানো যায়। ইদুরের পক্ষে যা সম্ভব তা ভারতবাসীর অসাধ্য হবে কেন? কারণ এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দেখতে গেলে ইংরেজ আসার আগে ক্ষমতা বা রাজশক্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণাচিন্তা যা ছিল তার মধ্যে পলিটিক্সের লেশমাত্র নাই, এগুলি নেহাৎ সনাতন সংস্কার মাত্র। তারা এসে তাদের শাসনকে রূপায়িত

করণ নানা ঔপনিবেশিক সংস্থায় তা পরিচালনার জন্যে নিয়ম বেঁধে দিল, নিয়ম ভাঙলে কাঁ সাজা হবে তাও ঠিক করে দিল আইনকানুন দিয়ে এবং ওইসব কিছু যাতে উচ্চবর্ণের বোধগম্য হয় তার জন্য একটা সংস্কৃতিকেও চালু করে দিল রাষ্ট্রক্ষমতা কায়ম ও বিস্তার করার উদ্দেশ্যে। এইসব সংস্থা ও তৎসংক্রান্ত সংস্কৃতি যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মের উপলক্ষ ও বিষয় তারই নাম পলিটিক্স এবং আলোচ্য ধারাটি অনুযায়ী সেই পলিটিক্সে উচ্চবর্ণের দীক্ষিত হওয়ার প্রণালীটির — learning process-কটিরই নাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের এই ব্যাখ্যায় আদর্শনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ জনসেবার স্থান নেই, আছে শুধু ঔপনিবেশিকতার বরে পাওয়া অর্থবশ ও ক্ষমতার লোভ; আর সেই লোভের লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছানোর জন্য ইংরেজ ও ভারতীয় উচ্চবর্ণের মধ্যে এবং শোষিতদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের কাহিনিই, এই মতে, জাতীয় আন্দোলনের মূল কথা।

অপরপক্ষে দ্বিতীয় প্রতিকল্পটির ছাঁচে সাজানো ইতিহাসবিদ্যায় জাতীয় আন্দোলনকে উচ্চবর্ণের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ও চালিত নির্ভেজাল আদর্শবাদী সংগ্রামের চেহারা দেওয়া হয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রধানত ভারতীয় ঐতিহাসিকদেরই কাজ, তবে বিদেশে লিবারল চিন্তাধারায়ও এর প্রকাশ বিরল নয়। এই ব্যাখ্যায়ও তারতম্য ঘটে; জাতীয় সংগ্রামের নায়ক রূপে উচ্চবর্ণের অবদান এতে সর্বস্বীকৃত হলেও সব ব্যক্তি, সংস্থা, নীতি ও তার বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যায়ন সকলের এক রকম নয়। তবে মোদ্দা কথাটা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। সে কথাটা হচ্ছে এই যে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম উচ্চবর্ণের মাহাত্ম্য ও আদর্শনিষ্ঠার কাহিনী মাত্র, এবং এই প্রতিপাদ্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ইংরেজের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার চেয়ে বিরোধিতার দিকটাই বাড়িয়ে দেখা হয়, শোষণ ও উৎপীড়ক হিসেবে তাদের সামাজিক ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করেই জনসেবায় তাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলা হয়, জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতি ব্যবহার করে তারা যে রাজদত্ত ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধার গৌণ ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারিতে লিপ্ত ছিল সেকথা চেপে গিয়েশোনানো হল স্বার্থলেশহীন আত্মত্যাগের অলীক রূপকথা। এইভাবেই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে জনগণের বিশাল আন্দোলনগুলি পরিণত হয়েছে উচ্চবর্ণের সংকীর্ণ জীবনবৃত্তান্তে।

এই পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে অবশ্য অনেক কিছুই শেখার আছে। দেশি ও বিদেশি উচ্চবর্ণের নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাজকর্ম ও চিন্তাধারা, তাদের ঐক্য অনৈক্য, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি তার চালক ও সহায়কদের মনোভাব, গণজীবন ও গণমত সম্পর্কে তাদের ধারণা

ইত্যাদি অনেক তথ্যের আকর এই ভাষ্য। তবে এই ইতিহাস থেকে যা সবচেয়ে শেখার কথা তা হচ্ছে এই যে ইতিহাসচেননা কখনো শ্রেণিচৈতন্যের সীমা অতিক্রম করতে পারে না।

কিন্তু এই ধরনের ঐতিহাসিক চিন্তা ও রচনার মধ্যে যা শিক্ষাপ্রদ তা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে তার সাহায্যে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ সেই অভিজ্ঞতার অন্যতম এবং মূখ্য উপাদান জনসমাবেশ, যা বলতে আমি বোঝাতে চাই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও তাদের সমবেত কার্যকলাপের সমন্বয়। এই অর্থে জনসমাবেশ যে কদাচিৎ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিল তা যেমন সত্যি তেমনি একথাও সত্যি যে সেই সমাবেশ অনেকবার এবং বহু ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল জনসাধারণের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উদ্যোগে, এমনকি সচেতনভাবেই ওইসব ব্যক্তি ও সংগঠনের তোয়াক্কা না রেখে, বরং তাদের বিরোধিতা করেই। সেই উদ্যোগের ফলস্বরূপ যে অজ্ঞত জমায়েতের কথা জানা যায় ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গাঙ্কির আবির্ভাবের আগেই তার দৃষ্টান্তগুলি না হয় বাদ দিচ্ছি, কারণ অনেকে হয়ত বলবেন যে তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকট ছিল না, যদিও ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ বা ১৮৯৯-১৯০০ সালের বিরসাপন্থী বিদ্রোহের মধ্যে জাতীয়তার অঙ্গুর বা পূর্বাভাস, যাদের চোখে পড়ে না অথচ সরকারি চাকরির অধিকার নিয়ে উনিশ শতকে উচ্চশিক্ষিতের বিক্ষোভ বা কংগ্রেসের প্রথম দশ বছরের কার্যকলাপে যারা জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখতে পান, তাঁদের মনশ্চকুতে চালুশে ধরেছে বলতে হবে। তবু এসব কথা আপাতত বাদ দিয়ে যদি ঔপনিবেশিক আমলের সেই পর্বটির কথাই শুধু ধরা যায় যখন জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব একেবারেই সন্দেহের অতীত, তখনো বহু বিরাট আন্দোলন ঘটেছে যার সবটাই বা অনেকখানি জনসাধারণের স্বতন্ত্র উদ্যোগের দৃষ্টান্ত, যেমন অসহযোগ যুগের কোন কোন সমাবেশ, ১৯৪২-এর আগস্ট সংগ্রাম, কিংবা দেশভাগের পূর্বাঞ্চে নৌবিদ্রোহকে উপলক্ষ করে শ্রমজীবী জনতার অভ্যুত্থান।

উচ্চবর্গের দৃষ্টভঙ্গির বাহন ইতিহাসবিদ্যার সাধ্য নেই যে জাতীয়তাবাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা স্বীকার করে কিংবা ব্যাখ্যা করে। কারণ তা হলেও মনে নিতে হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু উচ্চবর্গের কৃতিত্ব নয়, এবং সেই অস্বস্তিকর সত্যটা তাদের স্বার্থ ও আদর্শের—ইডিওলজির—বল্গায় বাঁধা ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায় না। অথচ ওই

ধরনের সমাবেশের ব্যাপক ও সংগ্রামী ভূমিকা এতই স্বতঃপ্রকাশ যে তা উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং ওই ইতিহাসে সাক্ষ্যপ্রমাণ সব উড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের যা স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল উচ্চবর্গ তাকে আত্মসাৎ করে চালিয়ে দিচ্ছে নিজেদেরই চিন্তা ও কাজ বলে। এককথায়, এই বিদ্যা ভারতবাসীর ঐতিহাসিক বিস্তার, গভীরতা ও জটিলতাকে উচ্চবর্গের পক্ষপাতী একটা অগ্রশস্ত, অগভীর, অতিসরল কীর্তিগাথায় পরিণত করেছে।

অথচ যে আদিকল্প থেকে এই ধরনের ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়েছে, একদা ইতিহাসবিদ্যার প্রগতি ঘটেছিল তারই জোরে। একথা আমি আগেই বলেছি। তারই জোরে তখন ইতিহাসচেননায় দেবলীলার পরিবর্তে মানুষের ঐহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং—জের টেনে—শেষ পর্যন্ত একথাও স্বীকৃতি পেয়েছিল যে ভারতের ইতিহাসে কেবল ইংরেজেরই নয়, ভারতবাসীর (যদিও উচ্চবর্গের অন্তর্ভুক্ত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর) অবদানও আছে। সেই ধাক্কার জোরেই তখন অতীতের কত নতুন দরজা খুলে গিয়েছিল, নতুন তথ্যের খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল, রাষ্ট্রসমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত নতুন সম্পর্ক উদ্ঘাটিত করেছিল আগলভাঙা হঠাৎ আলো। কিন্তু সেই আদিকল্পটি আজ বৃদ্ধ, সে তার সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা মোটেই নতুন ব্যাপার নয়। এক সময় জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হত ভূকেন্দ্রিক আদিকল্পকে অশ্রয় করে। কোপার্নিকাস তারই ভিত্তিতে এমন সব প্রমাণ করে বসলেন যে ওই টলেমির বিদ্যার সাহায্যে তার উত্তর মেলে না; এইসব নতুন প্রশ্নের চাপেই শেষ পর্যন্ত সেই পুরনো আদিকল্প ভেঙে পড়ল, তার জায়গা জুড়ে বসল সূর্যকেন্দ্রিক আদিকল্প, এবং জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যযুগীয় চিন্তার রাজত্ব শেষ হল। আলেক্সান্ডার কোয়ারে, টমাস কুন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে এইভাবেই বিজ্ঞানের একেকটি শাখায় সংকট ঘটেছে যখন প্রতিষ্ঠিত আদিকল্পগুলির নিজ প্রতিভাবলেই এমন সব সমস্যা তৈরি হয়েছে যার সমাধান তাদের তত্ত্ব ও অভ্যাসের অধীন নয়, আর তখনই নতুন কোন আদিকল্প এসে সেই সংকট সমাধান করেছে।

আমরাও ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আছি। কারণ তারই অভ্যাস থেকে এমন সব প্রশ্ন উঠেছে যার উত্তর পুরনো আদিকল্পটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রশ্নগুলির একটা সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করে শোনাতে গেলে আপনাদের সময় নষ্ট হবে, কারণ তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য; গবেষকদের জিজ্ঞাসার পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নতুন নতুন প্রশ্ন বা পুরনো প্রশ্নই নতুনভাবে উঠেছে ও উঠবে। তবে তাদের প্রবণতায়

মোটামুটি মিল আছে। সেই মিলের কথা মনে রেখে তাদের বিষয়বস্তুটির একটি সাধারণ বর্ণনা তৈরি করা যায়। প্রশ্নগুলি প্রায় সবই গড়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাকে ঘিরে। জিজ্ঞাসাটি এই: আমাদের জাতীয়তার আন্দোলনে রাজনৈতিক সমাবেশের চরিত্রটা কী ছিল? বিষয়টা নতুন নয়, কারণ প্রচলিত উদ্ভূতগুলি সম্পর্কে সাম্প্রতিক ইতিহাসচেনার অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষেরই পরিণতি হিসেবে একদা-অপাত্তের তথ্যকে সম্মানিত করা ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্যে, ঐ কারণেই এতদিন যা বিশ্লেষণের নিঃসংশয়িত পদ্ধতি বলে গণ্য হত তাকে আবার যাচাই করে নেবার চেষ্টা, আর সবচেয়ে বড় কথা—ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসকে বিচার করা নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে।

দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা হয়ত আরো পরিষ্কার করে বলা যায়। যেমন—একথা যদি সত্যি হয় যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উৎপত্তি হয়েছিল ইংরেজের তৈরি শাসনসংস্থা থেকেই এবং তার বিকাশ ঘটে ওইগুলিকে আশ্রয় করেই, তাহলে দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন হয়েছিল কোন প্রেরণায়? সেখানে তো আভ্যন্তরীণ, বিশেষ করে গ্রামীণ শাসনসংস্থায় ইংরেজরা হাত দেয় নাই। কিংবা যদি উচ্চবর্ণের প্রতিভা-ই জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রতিনিধিত্বনীয় সংগঠন বা ব্যক্তির সদরি ছাড়াও, বরং তাদের নেতৃত্ব ও পরামর্শউপেক্ষা করেই যেসব ঐতিহাসিক গণসমাবেশ ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা কেমন করে হয়? উচ্চবর্ণের উদ্যোগসিদ্ধ খাড়াখাড়ি সমাবেশই যদি গণআন্দোলনের একমাত্র বাহন হয়ে থাকে, তাহলে নিম্নবর্ণের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদায় সমকক্ষ শ্রেণি গোষ্ঠী জাতি বা সমূহ যে নিজেদেরই উদ্যোগে বারবার সামিল হয়েছে আড়াআড়ি সমাবেশে তার তাৎপর্য বোঝার উপায় কী? এই যে লাখ লাখ লোক জেল পুলিশ কালাপানি ফাঁসি, নিদেনপক্ষে বেকারি ও অন্নভাবের অনিবার্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাড়া দিয়েছিল দেশের ডাকে, আসলে কি তারা সকলেই বা অধিকাংশই নেমিয়ার বর্ণিত পিপড়ের মত রাজদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধুভাণ্ডের দ্বারাই শুধু আকৃষ্ট হয়েছিল? ইংস্বার্থ আদর্শের কণামাত্রও কি নেই তাদের চেতন্যে? তাদের সেই চেতন্য কি নিশ্চ্রাণ ও স্থূল জড়পিণ্ড মাত্র, যার আলো সবটাই ধার করা উচ্চবর্ণের জীবন্ত ও প্রথর চেতন্য থেকে, পৃথিবীর আলো যেমন ধার করা সূর্য থেকে? যদি তা সত্য না হয়, যদি নিম্নবর্ণের চেতন্যকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কি এবং উচ্চবর্ণের চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও মানসিকতার সঙ্গে তার সংঘাত ও সমঝোতা—এক কথায়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক—বুঝে কোন তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ

পদ্ধতির সাহায্যে?

এইসব প্রশ্ন উঠেছে প্রচলিত আদিকল্পটির অভ্যাস থেকেই, অথচ তার সাধ্য নেই এগুলির উত্তর দেয়। এটাই সেই আদিকল্পের সংকট। এই সংকটের নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসবিদ্যায়। লক্ষণ শুধু এই নয় যে নতুন সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েও তা সমাধান করতে পারছেন না বলেই উচ্চবর্ণের মুখপাত্ররা আগের চেয়েও বেশি তারত্বের বলার চেষ্টা করেছেন যে ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতি ও জন্মায়ত্তের এই অভিজ্ঞতা সবটাই দেশি বা বিলিতি বুর্জোয়াদের কৃতিত্ব। লক্ষণ আরো এই যে এমনকি যারা জাতীয়তাবাদে ও জাতীয় আন্দোলনে নিম্নবর্ণের ভূমিকা সত্যিই বুকতে ও বর্ণনা করতে চান, সেই সব লেখক ও গবেষকও অনন্যোপায় হয়ে উচ্চবর্ণের দৃষ্টিভঙ্গিতেই শরণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সমাজের নীচের তলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সমাবেশগুলিকেও দলাদলি বা খাড়াখাড়ি জন্মায়ত্তের গতানুগতিক ছকে সাজাবার চেষ্টা করছেন। প্রচলিত আদিকল্পটি দেউলে হয়ে গেছে বলেই নিম্নবর্ণের চেতন্যের সুস্থ প্রকাশ বিদ্রোহী সমাবেশগুলি যেমন ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্যে তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, তেমনি জাতপাতের ঝগড়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার অসুস্থ প্রকাশকেও গণসমাবেশেরই আরেকটি চেহারা বলে স্বীকার না করে চালানো হচ্ছে কেবলমাত্র ইংরেজেরই ভেদনীতির কুফল বলে। অর্থাৎ আবার সেই একই কথা—নিম্নবর্ণের মানুষের চেতনায় স্বকীয়তা বলে কিছু নেই; তার মধ্যে যেটুকু ভালো বা মন্দ তার সবটাই যথাক্রমে দেশি ও বিদেশি উচ্চবর্ণের কাছ থেকে পাওয়া।

উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী এই ইতিহাসবিদ্যার সংকট থেকে বেরোতে হলে সমালোচনা দিয়েই শুরু করতে হবে। সমালোচনাই নতুন পথ খোঁজার উপায়। আমি খোঁজার কথাই বলছি, পৌঁছানোর কথা নয়। কারণ পৌঁছে যাব শুধু তখনই যখন একেবারে নতুন কোন আদিকল্পকে বসানো যাবে পুরনোটের জায়গায়। এই ধরনের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ শুধু নয়, অনেক এগোনো-পেছনো, হারিয়ে যাওয়া, ছোট্ট খাওয়া তার স্বভাবসিদ্ধ এবং সেজন্যই জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে আকস্মিকতার অভাব নেই। সুতরাং এই পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ একেবারে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা অবাস্তব হবে। তবে যে-সংকটের কথা এতক্ষণ আলোচনা হল তার লক্ষণগুলি মনে রেখে বলা যায় যে ইতিহাসবিদ্যাকে ঢেলে সাজাতে হলে নিম্নবর্ণের দিকে চোখ ফেরাতে হবে, ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি এবং সবকিছুরই ওপরে রাজনীতিতে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা কী ছিল তা নির্ণয় করতে

হবে, সেই উদ্দেশ্যেই নতুন তথ্য খুঁজতে ও পুরনো তথ্যকে নতুনভাবে পড়তে হবে, দরকার হলে বিশ্লেষণের পুরনো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা তৈরি করে নিতে হবে, আর এই সবকিছুকে সম্ভব করার জন্যই তথ্যপ্রতি অভ্যাসের সঙ্গে মেলাতে হবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।

নিম্নবর্ণের রাজনীতি ও ইতিহাসবিদ্যার দায়িত্ব

উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ বলতে কী বোঝায় আমি কাল তার কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিনি। তবু এই শব্দ দু'টি যে ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে একটা মৌলিক ভেদের সূচক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে ভুল হবার কথা নয়। আজ আমার বাকি বক্তব্যের প্রস্তাবনা করছি ওই দু'টি শব্দের সংজ্ঞা দিয়ে।

উচ্চবর্ণ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুত্বাধীনদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু'ধরনের—সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই; আর বেসরকারি বলতে গণ্য বিদেশিদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি চা-বাগান কফিলেত বা ওই জাতীয় যেসব সম্পত্তি প্লান্টেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারি, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি।

দেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও একটা মোটা ভাগ ছিল সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের পার্থক্য অনুযায়ী। সর্বভারতীয়দের মধ্যে গণ্য বৃহত্তম সামন্ত প্রভুরা, শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত সবচেয়ে শক্তিশালী বুজুয়ারা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র বা শাসনবস্ত্রের অন্যত্র যারা ছিল সবচেয়ে উচ্চপদের অধিকারী।

দেশি প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিনিধিরাও আবার দু'রকমের। এক রকম হচ্ছে তারাই যারা আসলে সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসের আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপাদান হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে; আরেক রকম হচ্ছে তারা যাদের প্রভুত্ব ষোলো আনই আঞ্চলিক বা স্থানীয়, কিংবা যারা অন্য সবঅর্থে প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য না হলেও আঞ্চলিক বা স্থানীয় অবস্থায় প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ

ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে না।

এই শেখোক্তাদের, অর্থাৎ দেশীয় প্রভুগোষ্ঠীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সম্পর্কে একটা কথা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কথাটা এই যে সামগ্রিক ও শুদ্ধ উচ্চবর্ণের এই অংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অসমতা, এবং সেই অসমতার কারণ দ্বিবিধ: এক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য; আর দুই, এই অংশটির সামাজিক গড়নের সাংকর্য, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য। এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে-শ্রেণি বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুত্বাধীন বঙ্গে গণ্য তারাই আবার অন্যত্র আরেক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন। একাধারে প্রভুত্ব ও অধীনতার প্রতীক বঙ্গেই তাদের মানসিকতা, রাজনৈতিক আদর্শ ও আচরণ, সখ্য ও শত্রুতার ঝোঁক ও তাৎপর্য সবক্ষেত্রেই এক নয়, বরং অর্থ ও উদ্দেশ্যের নানারকম ঝবিরোধিতায় তা প্রায়শই অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রামভ্রমণের মধ্যে যারা অর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষকশ্রেণি—এরা সকলেই আমার সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্ণের অন্তর্গত হলেও বহুক্ষেত্রেই অবস্থায় চাপে ও চেষ্টানোর অন্তর্ভুক্ত উচ্চবর্ণের সপক্ষে কাজ করে। আদর্শের বিসৃষ্টতা থেকে বাস্তবের এই বিচ্ছিন্নতা ও তারই পরিণামে যে ঐতিহাসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাই গবেষণার দায়িত্ব।

ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্ণের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্ণ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তদের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি চাষি নিম্নবর্ণের মধ্যে গণ্য। তাছাড়াও এই সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিশ্রুত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভ্রমণ, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষকরাও—যদিও, একটু আগেই যেমন বলেছি, এদের ভূমিকা স্পষ্ট নয় বরং দোঁটিনায় জটিল এবং বাস্তবে এরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সামাজিক সত্তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ না করে উচ্চবর্ণের স্বার্থ অনুযায়ী চলে।

আমার বক্তব্য থেকে একথা হয়ত এতক্ষণে পরিষ্কার হল যে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের বৈপরীত্য ব্যবহার করে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিন্যাসের মূল সূত্রটি সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণায় আমি পৌঁছতে চাই। এই বৈপরীত্যের ওপর জোর দিয়ে ঔপনিবেশিক

যুগের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রয়োজন মনে করি এই জন্য যে প্রচলিত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির সাহায্যে তখনকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব নয় বলেই নিম্নবর্ণের ভূমিকা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিগুলি দু'ধরনের: তাদের মধ্যে একটিকে বলা যায় মেটা কায়দা, অন্যটিকে মিহি কায়দা।

মেটা কায়দার বিশ্লেষণে শুধু ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্পর্কটাই রাজনীতির বিষয় বলে স্বীকৃত হয়। ফলে ঐতিহাসিক যদি বিদেশি উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী হন তাহলে ওই যুগের অভিজ্ঞতা শাসকদের অভিজ্ঞতায় আত্মীকৃত হবে, আর তিনি যদি দেশি উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী হন তাহলে তা আত্মীকৃত হবে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের চিন্তায় ও কাজে। উভয়তই নিম্নবর্ণের ঐতিহাসিক চেতনা ও কর্মের কোন স্বীকৃতি নেই।

মিহি কায়দার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য জাতি ও শ্রেণিগত সম্পর্ক বিচার করা। সমাজের নীচের তলার বাস্তব অবস্থা বোঝার পক্ষে মেটা কায়দার চেয়ে এটি অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতি সম্পর্কে কোন সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা সম্ভব নয় কেবলমাত্র জাতভেদ ও শ্রেণিভেদের ভিত্তিতে। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ফলে জাতি-জাতি ও শ্রেণি-শ্রেণিতে পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারাটা সর্বত্রই এক রকমের নয়। এই অবস্থায় বিশ্লেষণের কাজ যদি ক্ষমতাবিন্যাসের একটি সাধারণ সূত্র আশ্রয় না করে এগোয় তাহলে জাতনির্ণয় ও শ্রেণিনির্ণয় যতই সূক্ষ্ম ও চূলেচরা হবে, ঐতিহাসিক বিবৃতি ততই বিব্রত হবে অনাবশ্যক তথ্যের বহুলতায় এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হবেই একরকম বহুত্ববাদী বর্ণনায় যা আসলে অতীতকে সম্যক বোঝার দায়িত্ব এড়াবার নামাস্তর মাত্র।

সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপায় হিসেবে এমন একটা মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণা তৈরি করে এগোতে হবে যা দিয়ে ক্ষমতাসূচক সব সম্পর্কই বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা শ্রেণিসম্পর্ক-জাতসম্পর্ক শাসকশাসিতের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির অথচ ঐ সম্পর্কগুলি সবই যার অন্তর্নিবিষ্ট। উচ্চবর্ণ বৈপরীত্য এই রকমই একটা কেন্দ্রীয় ধারণা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজে ক্ষমতার এমন কোন অভিব্যক্তি নেই যা এই ছাণুক সন্দ্বন্দ্ব দিয়ে বোঝা বা বোঝানো যায় না। জাত শ্রেণি সম্প্রদায় ও অন্যান্য সমূহের নানা অংশের মধ্যে, রাজাপ্রজা স্ত্রীপুরুষ জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ প্রভৃতির মধ্যে, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র ক্ষমতাবৈষম্যে সেই বৈপরীত্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। এবং তা যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রকট, আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও

হেমান। এক কথায়, যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রয়োগে নমনীয় বলেই, অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ও সামান্যতা উভয়কেই বোধগম্য করতে পারে বলেই এই ধারণাটি এত শক্তিশালী।

এই বৈপরীত্যের কথা মনে রাখলে ঔপনিবেশিক আমলের রাজনীতি সম্পর্কে একটা পাঠ্যপত্র এবং প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। বিশ্বাসটা এই যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সবটাই একটিমাত্র উপাদানে তৈরি, সেই উপাদান ইংরেজ-পন্থিত উদারনৈতিক শিক্ষাসংস্কৃতি থেকে নেওয়া বা তারই প্রত্যক্ষ ফল, এবং ওই রাজনীতির ক্ষেত্রটি অখণ্ড। ইতিহাসের সব ব্যাখ্যাতেই—তা ঔপনিবেশিকতার পক্ষপাতী হোক কিংবা জাতীয়তার পক্ষপাতী হোক—সব ব্যাখ্যাতেই এই কথাটা অবিসংবাদী বলে গণ্যমিত হয় এবং এটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েই বক্তব্য সাজানো হয়ে থাকে।

কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে বিশ্বাসটা অমূলক। কারণ ইংরেজ আমলের ঐতিহ্যে উচ্চবর্ণের রাজনীতির পাশাপাশি আরেকটি রাজনীতির অস্তিত্ব এতই স্পষ্ট যে সেটা গম্যে ভুল হবার উপায় নেই। সেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণই নায়ক, উচ্চবর্ণ নয়; নিম্নবর্ণের প্রতিভাই সেই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত সব চিন্তা ও কাজের চালিকা শক্তি; এক কথায়, তা রাজনীতির একটি স্বতন্ত্রক্ষেত্র। ক্ষেত্রটির বৈশিষ্ট্য তার ঐতিহাসিক উৎপত্তি, সমাজশেষের চরিত্র, আদর্শরূপ ও বাস্তব ভিত্তি অনুযায়ী সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এই রাজনীতির মূল উপাদানগুলি ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেই অর্থে সনাতন হলেও প্রাকব্রিটিশ যুগের উচ্চবর্ণের রাজনীতির মত তা ঔপনিবেশিক অবস্থার চাপে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় নি। ১৭শ শতক অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে এবং তারই মধ্যে চেতনা ও ব্যবহারের নানা বৈশিষ্ট্য মনে আকারে ও গুণে কিছু নতুনত্ব নিয়ে তা ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছে—এবং এখনো বোধ হয় কাজ করে যাচ্ছে (যদিও বর্তমান ভারতের কথা আমি বর্তমান আলোচনার বাইরে রাখতে চাই)। মোটামুটি বলা চলে যে ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও বিকাশের দিকে থেকে বিচার করলে নিম্নবর্ণের রাজনীতির ক্ষেত্রটি পুরনো চোখে আধুনিক এবং উচ্চবর্ণের রাজনীতির তুলনায় তার পরিপ্রেক্ষিতের গভীরতা ও দৃঢ়তা সত্ত্বেও অনেক বেশি।

এই রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নবর্ণের সমাবেশের কায়দায় ও চরিত্রে। উচ্চবর্ণের সমাবেশের কায়দা সমাবেশকে যদি খাড়াখাড়া বলে বর্ণনা করা যায় তাহলে নিম্নবর্ণের

উদ্যোগজাত সমাবেশকে আড়াআড়ি বলে বর্ণনা করা চলে। ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা যেসব সংস্থা এদেশে চালু করেছিল এবং প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে সামন্তশাসনের সহায়ক যেসব সংস্থা তখনও একান্ত অকেজো হয়ে যায়নি সেগুলিই ছিল খাড়াখাড়া সমাবেশের উপায়। কিন্তু আড়াআড়ি সমাবেশের প্রধান উপায় নিম্নবর্ণের সমাজে কুটুম্বিতা ও আঞ্চলিকতার প্রভু বিধিব্যবস্থা কিংবা শ্রেণিসংস্থা বা এই দুইয়ের নানারকম সমন্বয়। উচ্চবর্ণের জমায়েতের বৌদ্ধ প্রধানত ছিল আইনের মধ্যে থেকে বরং আইনকে আশ্রয় করেই কাজ চালানো, আইনভঙ্গের মধ্যে যথাসাধ্য লিপ্ত না হওয়া; নিম্নবর্ণের জমায়েত যথাসম্ভব আইনসংগত রাস্তা ধরে এগোত ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজন হতে তা বেআইনি এমনকি হিংসাত্মক হয়ে উঠত অপেক্ষাকৃত সহজে এবং আরো তাড়াতাড়ি—তাই এই জমায়েত উচ্চবর্ণের কাছে অনেক সময়েই খুব অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হত। ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নবর্ণের এই জমায়েতের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী রূপ দেখা যায় তৎকালীন কৃষকবিদ্রোহগুলিতেই; শহরে মধ্যবিত্ত, শ্রমিক বা অন্যান্য গরিব জনতার সমাবেশেও তখন ওই প্রকার বিদ্রোহী কৃষক জমায়েতের আদিকল্পটি বহু লক্ষ্য স্পষ্টই চোখে পড়ে। উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী ইতিহাসবিদ্যার পক্ষে নিম্নবর্ণের জমায়েতের এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ করলেই যে-আদিকল্পটি সেই ইতিহাসবিদ্যার ভিত্তি, তাকে অস্বীকার করতে হয়। এই রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আদর্শগত। নিম্নবর্ণের সামাজিক সত্তা যেসব উপাদানে তৈরি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চৈতন্যের স্তর ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়। তাই তাদের আদর্শগুলির মধ্যে অমিল এমনকি পরস্পরবিরোধিতাও ছিল, এবং তারই ফলে সেই রাজনীতির সামগ্রিক আদর্শের চেহারটি অবস্থাভেদে এক-একরকমের হয়ে দেখা দিত। মোটামুটি বলা চলে যে কোন পরিস্থিতি বা ঘটনার মধ্যে এই রাজনীতির এক বা একাধিক উপাদান যখন অন্য উপাদানগুলির চেয়ে বড় হয়ে উঠত তখন তারই প্রভাবে অন্তত সাময়িকভাবে সেই রাজনীতির আদর্শগত গুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হত। ফলেই অবস্থাভেদে এই আদর্শের নানান ধারার মধ্যে কিছু কিছু প্রকারভেদ ও অসমতা লক্ষ্য করা যায়। তবে অসমতা সত্ত্বেও যা সর্বত্র প্রকট তা হচ্ছে উচ্চবর্ণের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সমন্বয়। এই দু'টির আপেক্ষিক গুরুত্বও আবার তারতম্য ছিল, কিন্তু বিরোধিতা যখন আনুগত্যকে ছাড়িয়ে যেত তখনই নিম্নবর্ণের রাজনীতির মৌলিকতা এবং উচ্চবর্ণের রাজনীতি থেকে তার পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে যেত।

এক গোষ্ঠীনিতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটির মূল্যধার প্রকৃতির দেওয়া ও মানুষের তৈরি সেই গাঢ়ন খনন যা দিয়ে নিম্নবর্ণের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা, তাদের কার্যিক ও মানসিক শ্রমে সংগঠন, এবং সর্বোপরি জীবিকা ও শ্রমের শর্তস্বরূপ শোষণশোষণিতের ক্ষমতাগত সম্পর্কগুলি নির্ধারিত হয়। উচ্চবর্ণের ইতিহাসবিদ্যায় এই সবকিছুই একটা সংকীর্ণ অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে। তার পক্ষে কিছুতেই স্বীকার করা সম্ভব নয় যে সেই অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা আসলে প্রভুত্ব ও অধীনতার সূত্রে নিয়ন্ত্রিত এবং এই দুটির টানাপোড়েনেই নিম্নবর্ণের রাজনীতি অনেক নকশা বোনা হয়ে থাকে।

নিম্নবর্ণের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে এতক্ষণ যা বলেছি সে বিষয়ে দুটি কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। নইলে অনেকে বাজে তর্কে সময় নষ্ট হবে। প্রথম কথাটি হচ্ছে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমি যেভাবে বর্ণনা করলুম তা তাদের শুদ্ধ রূপ। বলাই বাহুল্য যে ঔপনিবেশিক যুগের বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবিকল এই রূপেই দেখার চেষ্টা নিরর্থক; স্থান কাল ও পাত্রভেদে এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সাধারণ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেই এক এক অবস্থায় এক এক ভঙ্গিতে কাজ করবে। আমি তাদের শুদ্ধ রূপটিকেই তুলে ধরেছি শুধু এই জন্যই যে আমার উদ্দেশ্য একটি তাত্ত্বিক প্রস্তাবের মূলসুঁত্রগুলি এখানে উল্লেখ করা। কিন্তু আমিই যখন আবার কোন বিশেষ ঐতিহাসিক প্রাতিষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করতে বসব তখন আমার কাজ হবে সেই তত্ত্বের আলোকে ওই প্রাতিষ্ঠানটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্ররূপকে পূর্বোক্ত শুদ্ধ রূপের সঙ্গে তুলনা করা এবং তুলনার ফলে যে পার্থক্য ধরা পড়বে তা দিয়েই সেই ঐতিহাসিক বিষয়টির অনন্যতা বর্ণনা করা।

এ প্রসঙ্গে আমার দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলির একটা পাকা ফর্দ বানিয়ে আমাদের কাছে পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং তা করাও সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক আমলের ইতিহাস নিয়ে এখন পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তারই ভিত্তিতে একটা সাধারণ গাণ্ডাকে মোটা কথায় সাজিয়ে বলা গেল। গবেষণা যতই এগোবে এবং নিম্নবর্ণের ইতিহাস নিয়ে চিন্তায় ও লেখায় আমাদের চেষ্টা যতই ব্যাপক ও নিপুণ হবে, বৈশিষ্ট্যগুলির চেহারা ততই বিশদ হয়ে উঠবে। তবে একান্ত সংগত কারণেই অসমাপ্ত এই বর্ণনা থেকে এতটাটা হয়ত পরিষ্কার হয়ে থাকবে যে প্রচলিত আদিকল্পটিকে আশ্রয় করে ঔপনিবেশিক আমলের রাজনীতি সম্পর্কে যে অদ্বৈতবাদী ধারণা ইতিহাসবিদ্যায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মানা যা দিয়ে ওই যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না,

বরং সেই অমৈত্রবাদী ধারণাটিই আসলে ঐ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উচ্চবর্ণের প্রাধান্য কয়েক
রাখার ও নিম্নবর্ণের ভূমিকা অস্বীকার করার মূল শর্ত।

এই বৈশিষ্ট্যবিচারের ভিত্তিতে তাহলে নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ঔপনিবেশিক যুগের
রাজনীতির ক্ষেত্রেই দ্বিধাবিভক্ত। কিংবা অন্য উপমায় বলা যায় যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের
চৈতন্য ও কর্মের বাহন দুটি স্বতন্ত্র ধারা বায়ে চলেছে ওই রাজনীতির মধ্যে। তবে সেই
সঙ্গে একথাও বেশ জোর দিয়েই বলা দরকার যে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ঐ দুই ধারাদুটি পরস্পর
নিরপেক্ষ নয়। নিরপেক্ষ নয় তাদের বৈপরীত্যের জন্যই। বিপরীত বলেই যে কোন দ্ব্যনুক
সম্বন্ধের রাশি দুটির মত তাদের একটি অপরটির অস্তিত্ব সূচনা করে, ঘোষণা করে।

কিন্তু এই সাধারণ অর্থ ছাড়াও একটি বিশেষ অর্থে তারা সম্পৃক্ত। সম্পৃক্ত এই কারণে
যে উচ্চবর্ণের কোন কোন অংশ কখনো কখনো এই দুটি ধারাকে তাদের নিজেদের উদ্যোগে
ও নেতৃত্বে মেলাতে চেষ্টা করেছে উভয়বর্ণের একত্রিত সমাবেশে। বিশেষ করে বুর্জোয়াদের
চেষ্টায় এই ধরনের সমাবেশ কয়েকটি বিরাট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের উপলক্ষ ও
হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যদিও তা সব ক্ষেত্রেই নেতাদের অভিপ্রেত ছিল এমন
নয়, বরং তাদের মধ্যে আপসের মনোবৃত্তি, জঙ্গি গণআন্দোলনের তেজ সম্পর্কে তাদের
ভয় এবং নিম্নবর্ণের চৈতন্যের নানা দুর্বলতার ফলে এইসব লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তাদের
প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয়নি। আন্দোলনে ভীতি এসেছে যখন, তখনই আবার বৈধি বন্ধ শিথিল
হয়ে পড়েছে এবং রাজনীতির স্বতন্ত্র ধারা দুটি তাদের নিজ নিজ খাতে ফিরে গেছে।
উচ্চবর্ণের নেতৃত্বেই এই দুটি ধারা কখনো আবার মিলিত হয়েছে এমন সব জমায়েতে যা
সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করা দূরে থাকুক কার্যত তাকেই সাহায্য করেছে সাম্প্রদায়িক
দাঙ্গা বা সামন্তশ্রেণির অস্বাভাবিক হিংস্রতার অস্ত্র হিসেবে নিম্নবর্ণকে ব্যবহার করে। তবে
সমাবেশের উদ্দেশ্য প্রগতির অনুকূলেই হোক বা প্রতিক্রিয়ার অনুকূলে একথা লক্ষ্য
করার মত যে এই দুটি রাজনৈতিক ধারা বা ক্ষেত্রের প্রতিচ্ছেদে প্রকাণ্ড বিক্ষোভ ঘটছে
বারেবারেই, কারণ ঠিক তখনই উচ্চবর্ণের নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করে তারই উদ্যোগজাত
আন্দোলনের মধ্যে নিম্নবর্ণের রাজনীতি তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুদ্রিত করেছে।

এই প্রতিচ্ছেদের বহু দৃষ্টান্ত আছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে। কিন্তু উচ্চবর্ণের
অগ্রণী শ্রেণি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সেইসব আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নিতে
পারেনি, তাকে পরিণত করতে পারেনি জাতির মুক্তিযুদ্ধে এবং বুর্জোয়াশ্রেণির সর্বশ্রুত

শাওঁ করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার দায়িত্বও পূর্ণ করতে পারেনি।

অপরদিকে নিম্নবর্ণের রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা স্বতন্ত্র উদ্যোগ গড়ে উঠেছে ঠিকই, তবু
ও জাতীয় আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ হয়ত
চল্লিশোজাতি ভারতে শ্রমিকশ্রেণির অপরিণত অবস্থা তার বাস্তব জীবনে ও চৈতন্যে।
ফলে শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে ওঠে নি, তাদের সর্বশ্রুততা প্রতিষ্ঠিত হয়নি,
এবং নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে নি নিম্নবর্ণের
মধ্যে অগ্রণী যারা তারাও।

এই দ্বিবিধ ব্যর্থতাই ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মর্মবস্তু। আমাদের
চিন্তায় ও বক্তব্যে এই বিষয়টিকে যদি সম্যক গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে ইতিহাসবিদ্যার
উচ্চবর্ণের পক্ষপাতী আদিকল্পটির বিরুদ্ধে সচেতনভাবেই বিদ্রোহ করতে হবে, আমাদের
সাধনাকে নতুন তাত্ত্বিকতা, নতুন তথ্য ও নতুন পদ্ধতি দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে,
উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের রাজনীতির বৈপরীত্য ও তাদের সম্পৃক্ত যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও
বর্ণনা করতে হবে, এবং সেজন্যই নিম্নবর্ণের ভূমিকাটিকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে
হবে।

এই প্রস্তাবসম্মত কাজ অর্থাৎ গবেষণা ও লেখা ঠিক কিভাবে এগোবে তার খুঁটিনাটি
আগে থেকেই বর্ণনা করার চেষ্টা নিরর্থক। যে কোন সৃষ্টিশীল প্রয়াসের মত ইতিহাস
রচনার মধ্যেও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের চমক হামেশাই দেখা যায়। এই আকস্মিকতা
একদিকে যেমন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও পুরনো তথ্যকে নতুনভাবে দেখার অবশ্যাব্যব
শ্য, অপরদিকে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার লীলাই
তার কারণ। সুতরাং নিম্নবর্ণের ইতিহাসবিদ্যার প্রগতি কোন ফতোয়া বা ভবিষ্য-বাণী দিয়ে
নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে তার মূল লক্ষ্যের দিকে চোখ রেখে দুয়েকটি কথা বলতে চাই
যা হয়ত এই অভ্যাসের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে কাজে লাগতে পারে।

এই কাজে যীরা নামতে চান তাঁদের প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে নিম্নবর্ণের ইতিহাস
নাচক তথ্য থেকে স্বতন্ত্রভাবে নির্গলিত হবে না। তথ্য ছাড়া ইতিহাস হয় না ঠিকই,
তা কিন্তু তা নিছক তথ্য নয়। নিছক তথ্য অভিধানিক শব্দের মত। ওই শব্দগুলির অভিধান
থেকে বাছাই করে তুলে যদি বাক্যবদ্ধে সাজানো যায় তবেই পারস্পরিক সম্পর্কের
খালোকে তারা তাদের বিশিষ্ট অর্থে ব্যক্ত হবে। শব্দ বাছাই করা ও সাজানো যেমন

বক্তার চৈতন্যের অভিব্যক্তি ভাষায়, তথ্য বাছাই কার ও সাজানো তেমনি ঐতিহাসিকের চৈতন্যের অভিব্যক্তি ইতিহাসবিদ্যায়। তথ্য বাছাই ও সাজানোর জন্য তাই একান্ত সচেতনভাবে দুটি মূল সূত্র ধরে এগোলে দিগ্ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম। সূত্র দু'টি সম্পর্কে আগেই বিস্তারিত বলা হয়েছে, তাই এখানে শুধু উল্লেখই যথেষ্ট হবে।

এক নম্বর সূত্র :

ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রটি অঞ্চল নয়, দ্বিধাবিভক্ত। তার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা — উচ্চবর্ণের রাজনীতির ধারা ও নিম্নবর্ণের রাজনীতির ধারা। স্বতন্ত্র হলেও এই ধারা দু'টি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। তারা বৈপরীত্যে বাঁধা এবং বৈবিল্যের মত কখনো কখনো তারা ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছেদে যুক্ত হয়, কখনো আবার নিজ নিজ খাতে বয়ে চলে।

দুই নম্বর সূত্র :

নিম্নবর্ণের ইতিহাস শুধু ঘটনার পরস্পর্য আশ্রয় করে বোঝা বা লেখা যাবে না। ঘটনা বা সাধারণভাবে বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের সম্পর্কটা পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই সম্পর্কটা আসলে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক, বৈপরীত্যের দ্ব্যণুক সম্পর্ক।

এই দুটি সূত্র ধরে গবেষণা, আলোচনা ও রচনার বিষয়বস্তু এবং বিশ্লেষণপ্রণালী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব আমি আপনাদের কাছে রাখতে চাই। শুধু তার আগে আবার বলছি এই প্রস্তাবটি কোন পাকা প্রোগ্রাম নয়। এর সবটাই আমার ব্যক্তিগত চিন্তা অভ্যাস অভিজ্ঞতা ও রচির অপরিণত এবং ইদানীন্তন নিদর্শন মাত্র। আমার নিজের কাজ যত এগোবে ততই এই প্রস্তাবটি আরো পরিশীলিত হবে, এবং আশা করি আপনারাও নিজ নিজ চিন্তা ও অভ্যাসের সাহায্যে এটিকে বদলে ও শুধরে নেকেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রথম মন্তব্য এই যে নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণি গোষ্ঠী ব্যক্তি ও সমূহকে ঐতিহাসিক গবেষণা ও বক্তব্যের বিষয় বলে স্বীকার করতে হবে সচেতনভাবে। এদের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবর্ণাবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা ইত্যাদি গণ্য তো বটেই। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটা যাদের জীবনে খুবই প্রকট অঞ্চল ধারা আমাদের ইতিহাসচিন্তায় এখনো প্রায় অনুপস্থিত সেই আদিবাসী,

নিম্নবর্ণ ও স্ত্রীলোকের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ করে ভাবতে ও লিখতে হবে। এইদিকে এগোতে গেলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে উচ্চবর্ণের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার বাহন প্রচলিত আদিকল্পটি আমাদের পথ জুড়ে আছে। তাই ১৯১৮ সালের আমেদাবাদ সূতাকল ধর্মঘটের ঐতিহাস যখন লিখতে বসব তখন যেন মনে রাখি যে সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধী, শংকরলাল ব্যাংকার ও অনুসূয়া সারাভাইয়ের জীবনীর অধ্যায় মাত্র নয়, তার মধ্যে শর্মখটীদের চৈতন্যের — শ্রেণিচেতনা যার অন্যতম উপাদান তার একটি মূল্যবান ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস মহাদেব দেশাই বা তেন্দুলকারের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়নি, তা আমাদেরই লিখতে হবে একেবারে আরেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আরেকটি আদিকল্পের প্রেরণায়। একাজে হাত দিলে দেখা যাবে যে উনিশ শতকের কৃষকবিদ্রোহগুলিকে নেহাৎ উদ্দেশ্যবাদী পন্থায় বিশেষ শতাব্দীর জাতীয়তা ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত না করে তাদের পমহিমায় দেখতে গেলে বিদ্রোহী চৈতন্যের একটি প্রধান লক্ষণ যে ধর্মচেতনা তাকে উর্জ্বে দেওয়া তো যায়ই না একাজে হাত দিলেই দেখা যাবে যে রাজনৈতিক জীবনীসাহিত্যে পুরনো ইতিহাসবিদ্যার প্রভাবে শুধু উচ্চবর্ণের গুণকীর্তনে মুগ্ধ; আমরা চাই যে তার মধ্যে তিতুমীর, সিধো, কানহ, মাদারি পাসীর কীর্তি উজ্জারিত হোক। আমরা এমন ইতিহাস চাই যার মধ্যে মেয়েরা অতীত সমাজের তথ্যকণিকা মাত্র নয়, যার মধ্যে তারা ঐতিহাসিক সভ্য বলে স্বীকৃত; যার মধ্যে আদিবাসী কৃষকদের জীবন ও আন্দোলনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবে না, কৃষকসমাজের সবচেয়ে নিম্ন ও সংগ্রামী অংশ গলেই বিবেচিত হবে; যার মধ্যে বর্ণানুক্রমে নিম্নতম বলে গণ্য যারা তাদের আন্দোলনগুলিকে উচ্চবর্ণের অনুকারী তথাকথিত সংস্কৃতায়নের সিঁড়ি বলেই শুধু বর্ণনা করা হবে না, বরং অনুকরণের পাশাপাশি এমনকি তার চেয়েও বেশি যে আক্কেশ ও তৎপন্নিত প্রতিবাদ ঐ সব আন্দোলনের স্বভাবসিদ্ধ তাও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিষয় বলে মানা হবে।

আমার দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে নিম্নবর্ণের ইতিহাসে গণসমাবেশের প্রসঙ্গটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ প্রচলিত আদিকল্পটির চাপে ইতিহাসবিদ্যার ঠিক এইখানটাতেই অনেক বিকৃতি ও অসত্যকে একেবারে স্বতঃসিদ্ধের আসনে বসানো হয়েছে। গণসমাবেশের পটভূমিটি অভিজ্ঞতাকে তাই নতুন করে বিচার করার, নতুনভাবে তার মূল্যায়নের সময় এসেছে। যারা নিম্নবর্ণের ইতিহাসের এই দিকটা নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে দু'য়েকটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই।

(এক) মনে রাখবেন যে পুরনো আদিকল্পটির প্রভাবে ইতিহাসবিদ্যায় সাধারণত সব গণসমাবেশকেই, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংক্রান্ত সমাবেশগুলিকে শুধু খাড়াখাড়ি জমায়েত বলেই ধরে নেওয়া হবে; কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উচ্চবর্ণের সহায়তা ছাড়া জনগণ কিছুতেই রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে না। নিম্নবর্ণের ইতিহাস লিখতে গেলে এই একদেশদর্শিতা প্রথমেই বর্জন করা দরকার। জমায়েতের মধ্যে খাড়াখাড়ি ও আড়াআড়ি এই দুটো কায়দাই কাজ করছে এই অনুমান আশ্রয় করেই গবেষণার প্রকল্প তৈরি করতে হবে। তা যদি না করেন তাহলে আড়াআড়ি জমায়েতের সাম্য চোখেই পড়বে না, বা পড়লেও তাকে খাড়াখাড়ি জমায়েতের সাম্য বলে ভুল হবে নির্ঘাৎ।

(দুই) উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে জনসমাবেশের অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলি সহজে ধরা পড়ে না, পড়লেও তার তাৎপর্য বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; কারণ ধরে নেওয়া হয় যে সেই সমাবেশ উচ্চবর্ণের চৈতন্যের আধার মাত্র, সুতরাং তার নিজস্বতা নেই, আর সেই নিজস্বতার প্রকাশ যে হচ্ছে ও বৈষম্যে তাও আলোচনার মধ্যে আসে না। নিম্নবর্ণের ইতিহাস কিন্তু সেই জমায়েত রাজনীতির পাল্টা ও স্বতন্ত্র ধারাটির খোঁজ করবে, আর খোঁজ পেলে—অর্থাৎ তা যদি তথ্যসম্মত হয়—তার মধ্যে নিম্নবর্ণের চৈতন্যের অসমতা, স্তরভেদ, উপাদান ও অবস্থানভেদে তার বিভিন্ন প্রকাশ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে সেই বিশেষ জমায়েতটির অনন্যতাকে বর্ণনা করবে। এখানে মনে রাখা উচিত যে জমায়েতের পাত্রস্থানীয় শ্রেণি, গোষ্ঠী বা সমূহের বাস্তব জীবন ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যই এই অনন্যতার একমাত্র কারণ নয়। একই স্থানে একই পাত্রের চৈতন্যে একই সমাবেশের মধ্যে কালভেদে গুণগত পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ আমাদের ইতিহাসে, বস্তুত সব দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান কৃষকবিদ্রোহে, ফরাসি বিপ্লবের সমকালীন মহাগ্রাসের (লা গ্রাঁদ প্যর) মধ্যে জার্মান ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, পূর্ব আফ্রিকার মাজি-মাজি অভ্যুত্থানে, আমাদের নিজস্ব নীলবিদ্রোহে, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ১৮৫৭-৫৮ সালে কৃষকবিদ্রোহগুলিতে, উত্তরবঙ্গে দেবীসিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে—অর্থাৎ যেখানেই জমায়েতের মেজাজ জঙ্গি ও আত্মকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, সেখানেই চৈতন্যের এই গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। অন্যত্র আমি এই পরিবর্তনকে ইংরেজিতে second wave বলে বর্ণনা করেছি। উপমর্মে একটু বদলে বাংলায় এর নাম দেব ‘দ্বিতীয় ধাক্কা’, কারণ সত্যিই এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাবেশের মধ্যে আপসের চেয়ে আঘাতের প্রবণতা ঠাণ্ডা

অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠে, তিক্ততা ও হিংস্রতার ভীষণ বেড়ে যায়, শ্রেণিসংগ্রামে দীর্ঘ ৭৩১ সমাজ গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এই ধাক্কা সামলাতে উচ্চবর্ণকে হিমশিম খেতে হয়।

(তিন) একথা যদিও সত্য যে স্থানকালপাত্র ভেদে এক একটি সমাবেশে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবুও তাদের মধ্যে, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত জঙ্গি জমায়েতগুলির মধ্যে আকৃতিগত মিল আছে অনেক। গ্রামাঞ্চলে প্রজাবিদ্রোহ, শহরের গরিব জনতার অভ্যুত্থান (যেমন ধরুন, রাওলাৎ সত্যাগ্রহের সময় দিল্লিতে), গ্রামে ও শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির মধ্যে আঞ্চলিকতায়, উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক পরিচয়ের নানা পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যাবে যে প্রায় একই রকমের কিছু কিছু উপায় ও সংকেতের সাহায্যে নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিরা তাদের মিত্রপক্ষকে একত্র করতে ও শত্রুপক্ষকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে সব ক্ষেত্রেই। এই সাদৃশ্যের মূল কারণ উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার অতি প্রাচীন সম্পর্ক এবং প্রভুর বিরুদ্ধে অধীনের বহুকালব্যাপী, যদিও ব্যর্থ, প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত, সবঙ্গীর্ণ, সনাতন ও সার্বত্রিক রূপ কৃষকবিদ্রোহ। তারই ঐতিহ্যে নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ধ্রুব উপাদান এবং ঠিক সেই জন্যই ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নবর্ণের সবরকম জঙ্গি জমায়েতেই কৃষকবিদ্রোহের কিছু কিছু লক্ষণ আদর্শে না হোক আকারে দেখা যাবেই। তাই আমার মনে হয় নিম্নবর্ণের সমাবেশের ইতিহাস নিয়ে যারা কাজ করতে চান, এমনকি যারা গ্রামসমাজের বাইরে অকৃষক জনতার সমাবেশ নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের পক্ষেও কৃষকবিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

এবার আমার প্রস্তাবটি সম্পর্কে তৃতীয় মন্তব্যে আসি। একথা বলাই বাহুল্য যে নিম্নবর্ণের ইতিহাসে তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি নিয়ে কাজ ইংরেজ রাজত্বের মধ্যেই আরম্ভ হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সে কাজ পরিমাণে যেমন বেড়েছে তেমন উন্নত হয়েছে। এই দিকে গবেষণার মোড় ফেরানো, তরুণ ঐতিহাসিকদের এই কাজে শিক্ষিত করা এবং মহাফেজখানাকে তথ্যের আকর হিসেবে ব্যবহার করা—সবই এই শহরে আজ থেকে গায় চল্লিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের প্রেরণায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ সেই উত্তরাধিকারে কত উর্বর কত সমৃদ্ধ তা আপনারা সকলেই জানেন। নিম্নবর্ণের ইতিহাস লিখতে হলে এই কাজ থেকে অনেক কিছুই শিখতে

হবে। তবে বিষয় নির্বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখা দরকার।

প্রথম কথাটি এই যে ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রভু অধীনতার সম্পর্কটি যে বিশিষ্টরূপে প্রকট হয় তা শোষক শোষিতের সম্পর্ক। তাই অর্থনীতির যে-কাঠামোটা আশ্রয় করেই সেই সম্পর্ক প্রধানত গড়ে ওঠে—অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা; অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখার জন্য আবশ্যিক লেনদেনগুলির মধ্যে যা কিছুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে—যথা মজুরি, খাজনা, ঋণ ইত্যাদি; এই সম্পর্কের অবশ্যস্বাভাবী পরিণাম যে দারিদ্র, বেকারি, দুর্ভিক্ষ, জমি হারানো, ফসলের ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, আবার অপরপক্ষে শোষকদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শোষিতের সামান্য একটি অংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে অধিকাংশকেই দরিদ্রতর করে তোলা—এই ধরনের সমস্যাকেই আমার মনে হয় নিম্নবর্ণের ইতিহাসে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, কারণ এইসব বিষয়ে কাজ করতে গেলেই যে তথ্য আবিষ্কৃত হবে, যে প্রশ্ন উঠবে, সমাধানের জন্য যে নতুন কৌশল ও তত্ত্ব আশ্রয় করে এগোতে হবে তা থেকে বারবারই একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে শোষক-শোষিতের সম্পর্কটি অর্থনৈতিক জীবনে প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কের বিশিষ্ট প্রয়োগ মাত্র।

এই প্রসঙ্গেই আমার দ্বিতীয় কথা—দৃষ্টিভঙ্গির কথাটা এসে পড়ে। ঔপনিবেশিক সমাজে নিম্নবর্ণের ইতিহাসে নিছক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে কিছু নেই। ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী অন্য যে কোন সমাজের মত সেখানেও অর্থনীতির অন্তর্গত সব সম্পর্কই আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, রাজনীতির সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। মজুরির হার, খাজনার হার, সুদের হার, সেখানে অবাধ কেনাবেচা চাহিদা-যোগানের নিয়ম মেনে চলে না, চলে শেষপর্যন্ত স্থানীয় সমাজে মালিক জমিদার মহাজনের প্রতিপত্তি ও শাসনের নিয়ম অনুযায়ী এবং উচ্চবর্ণের এইসব আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের উপরওয়ালার, তাদের সকলেরই পোষক রাজশক্তির শাসন অনুযায়ী। তাই নিম্নবর্ণের অর্থনৈতিক জীবনের সব বর্ণনার মধ্যেই ক্ষমতার এই সম্পর্কটিকে, অর্থাৎ প্রভু ও অধীনতার সম্পর্কটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই জন্যই ঔপনিবেশিক যুগের যন্ত্রশিল্পের ইতিহাস শুধু যদি কলকারখানার বর্ণনা, মজুরি ও মুনাকার হার ও পরিমাণ, এমনকি লভ্যাংশের বন্টন নিয়ে মালিক-মজুরের মধ্যে কড়াগড়ার লড়াই বলেই দেখা ও লেখা হয়, তাহলে ক্ষমতার সম্পর্কটি তার মধ্যে হয় ধরা পড়বেই না, বা পড়লেও গৌণভাবে। তাই কারখানার মালিকানার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রভুত্বের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও যান্ত্রিক নিয়মের বহির্ভূত

শাসনের চাপে উৎপাদন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার জন্য কাজের সময় শ্রমিক ও যন্ত্রের মধ্যে মালিক বা তার প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বসূচক হস্তক্ষেপ, কলকারখানার বিষয়ে সরকারি আইনকানূনের ভূমিকা, কারখানার বাইরে বস্তি, লাইন, চুল বা মহল্লায় মালিক মহাজন প্রভৃতির সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক, ইউনিয়ন বা এই জাতীয় সংস্থায় আশ্রমিক নেতা বা কর্মী ও শ্রমিকের মধ্যে ক্ষমতাবৈষম্যের খেলা, কারখানার জন্য শ্রমশক্তি যোগান দেওয়ার ব্যাপারে সদারি প্রথা ও সেই সূত্রে গ্রামসমাজের সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রভাব শহরের শ্রমিক জীবনে—এইসব কিছুই যন্ত্রশিল্পের অর্থনৈতিক দিকগুলির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতে হবে। তেমনি আবার বলা যায় যে কৃষকের কত জমি আছে, কত খাজনা বা কর তাকে দিতে হয়, সুদে আসলে তার কাছে মহাজনের কত পাওনা, ফসলের দর ও লাভ-লোকসানের হিসেব—এইসব দিয়েই শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাস যদি লেখা হয়, তাহলে তা তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কৃষকজীবনের একপেশে, সুতরাং বিকৃত বর্ণনায় পর্যবসিত হবে। কারণ কৃষকজীবনের সত্য এই তথ্যগুলির মধ্যে বিদ্যমান নয়, প্রভুত্ব ও অধীনতার যে বিশিষ্ট সম্পর্ক এই সব তথ্যের ধারক তারই মধ্যে কৃষকজীবনের সত্যকে সন্ধান করতে হবে, সেই সত্যের আলোকেই এই সব তথ্য অর্থময় হয়ে উঠবে। ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামজীবনে সেই সম্পর্কের মূল কথা জমিদার মহাজন ও সরকার—এই ত্রিশক্তির সঙ্গে কৃষকের ক্ষমতাগত সম্পর্ক। সেই সম্পর্কই অর্থাৎ রাজনীতিই ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতির প্রধান ধ্রুবগুণ; নিম্নবর্ণের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে তাই ব্যাপক অর্থে বা রাজনৈতিক ইতিহাস নামে পরিচিত তারই শাখা বলে ভাবা যায়, যদিও নিঃসন্দেহেই তা সেই জ্ঞানকাণ্ডের একটি প্রৌঢ় ও বহুপল্লবিত শাখা।

নিম্নবর্ণের ইতিহাস বিষয়ক প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমার চতুর্থ মন্তব্যে চৈতন্যের দুটি লক্ষণের কথা বলতে চাই। এ যাবৎ আমার সব বক্তব্যের মধ্যে আমি প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কটিকে রাজনীতির মর্মস্থলে রেখেছি, বলেছি যে এই সম্পর্কটিই একাধারে রাজনীতির মুখ্য উপাদান ও তার নিয়ন্ত্রক। প্রভুত্ব ও অধীনতা যথাক্রমে সেই সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত বর্গদুটির—অর্থাৎ উচ্চতর ও নীচের—চৈতন্যের সাধারণ গুণ। নিম্নবর্ণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই অধীনতার চরিত্রটির পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে প্রভুত্ব ও অধীনতা যেমন ছাপুক বৈপরীত্যে সূত্র বাঁধা, অধীনতাও তেমনি একটি ধন্যক সত্তা যা নিজেই আবার দুটি রাশির বৈপরীত্য দিয়ে গড়া। সেই রাশি দুটি হচ্ছে সহকারিতা ও প্রতিরোধ। নিম্নবর্ণের ইতিহাসে দুটি রাশিই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, যদিও

অবস্থানভেদে একটি অপরটির চেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে এবং অধীনদের চৈতন্য হয় একটি বা অন্যটি তার প্রাধান্য কয়েক করে সাময়িকভাবে। তাই একথা মনে করা ভুল হবে যে প্রতিরোধই নিম্নবর্ণের চৈতন্যের একমাত্র উপাদান। বরং অসাম্য সংঘেও যেহেতু সমাজ সাধারণত স্থিতিশীল তাই অতৃপ্তি না করেই বলা চলে যে সহকারিতাই প্রতিরোধের চেয়ে সাধারণত বেশি শক্তিমান। তবে একথাও সত্যি যে প্রতিরোধ বিদ্রোহের পর্যায়ে না পৌঁছলেও সহকারিতার পাশাপাশি তার একটি ধারা যতই ক্ষীণ হোক তা সব ঐতিহাসিক অবস্থায় এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও সবসময়েই বয়ে চলেছে, যেমন অপরপক্ষে বলা যা যে প্রতিরোধের চূড়ান্ত রূপ বিদ্রোহের এমন কোন নজির ইতিহাসে নেই যার মধ্যে সহকারিতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ধর্মভাব নিম্নবর্ণের রাজনীতির একটি প্রধান উপাদান। উচ্চবর্ণের ইতিহাসবিদ্যায়—ইংরেজ শাসকদের লেখায় বা আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে অনেক লিবারল ঐতিহাসিক লেখায়ও এই চেতনাকে শুধু ধর্মোন্মাদ বলেই দায় সারা হয়, যেন ‘আসল’ রাজনীতি বলতে তাঁরা যা বোঝেন তা একেবারেই আলাদা জিনিস। অপরপক্ষে নিম্নবর্ণের প্রতি যাদের সহানুভূতি আছে তাঁরাও অনেক সময় এই ধর্মচেতনার সাক্ষ্য নিয়ে একটু বিরত বোধ করেন এবং ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যার মধ্যে সেই সাক্ষ্য হয় একেবারেই চেপে যান কিংবা উড়িয়ে দেন এই বলে যে ওটা আসল কথা নয়, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাটাই আসল কথা এবং সিলো কান্ধু বিরসা প্রমুখ বিদ্রোহী নেতারা নিজেরা ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, শুধু কৃষকজনতাকে জমায়েত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ধর্মের জিগির তুলেছিলেন। এক কথায়, উভয়পক্ষই ‘আসল’ রাজনীতি বলতে ধর্মভাববহিত চৈতন্যের একটি বিশেষ রূপকে বোঝেন।

এটা একটা মারাত্মক ভুল এবং এ বিষয়ে সতর্ক না হলে নিম্নবর্ণের ইতিহাস লেখা দুষ্কর। ঐতিহাসিককে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক দেশেই ধনতান্ত্রের পূর্ণ বিকাশের আগে, জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার আগে, এমনকি তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চোখে, বিশেষ করে রাজধানী শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে গ্রাম ও মফস্বলে যারা থাকে তাদের চোখে রাষ্ট্রের সামগ্রিক চেহারাটা সহজে ধরা পড়ে না। তারা রাষ্ট্রশক্তিকে দেখে তার স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতার গোপ্পদে। আর তাদের ধারণায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও স্থানীয় রূপের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে তা তারা ভরে দেয় ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক বিশ্বাস দিয়ে। এইজন্যই ক্ষমতার পিরামিডের

‘পালা’ যারা একেবারেই মাটির কাছাকাছি সেই নিম্নবর্ণের কাছে পিরামিডের শীর্ষস্থ গাভরাটিকে দেবশক্তি বলে মনে হয়। তাই জারের অধীন রাশিয়ায় জারেরই কসাক গাভরাটের হাথলায় পর্যুদস্ত জনতা জারের কাছেই সুবিচার প্রার্থনা করে, এমনকি বিদ্রোহ করে জারের নাম নিয়েই। কারণ যে রাষ্ট্রকে তারা জানে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মারফত, কসাক বাহিনীই তার প্রতিভূ তাদের কাছে; কিন্তু স্বয়ং জার আরেকটি, আরো শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিভূ। এই দ্বিতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ববাস্তবে নয়, কল্পনায়; তাকে যা চালায় তা মানুষের ইচ্ছাশক্তি নয় দৈবশক্তি; ক্ষমতার যে নিয়মের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা ন্যায়গতিক অধিকার ও দায়িত্বের সংজ্ঞায় সাজানো কোন সংবিধান নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় শর্মভাবের দ্বারা। এক কথায় বলা যায় যে সেই রাষ্ট্র একটি অলীকরাষ্ট্র।

এই অলীকরাষ্ট্র নিম্নবর্ণের ধর্মশ্রমী রাজনীতিকে যে বারবার প্রভাবিত করেছে একথা মনেই আসে। উদাহরণগুলি সুপরিচিত; যেমন, আঠরো শতকে দেবী সিংয়ের বিরুদ্ধে উদ্যত সশস্ত্র কৃষকজনতা কোম্পানির দোহাই দিয়েই কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়ত; উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালি ও মারাঠি কৃষক মহারানির সাম্রাজ্যের স্থানীয় প্রতিনিধি ও তাদের পোষা উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ইত্যাদি। জানা কথা, অলমতিবিস্তরণে। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই ধরনের দৃষ্টান্তে কোম্পানি ও মহারানি এ একই বিশ্বাসের প্রকাশরূপে লাটসাহেব, মেজিস্টার সাহেব, জজ সাহেব প্রমুখ শর্মভাবতারের স্থান নিম্নবর্ণের চেতনায় দেবদেবীর সঙ্গেই।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে করি। অলীকরাষ্ট্রবাদের ঐতিহাসিক রূপ সম্পর্কে মার্কস বলেছেন যে এই প্রকার চিন্তা সেইসব শ্রেণিরই চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য যারা উঠতির মুখে, যাদের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাকে গাণ্ডবিক করার জন্য আবশ্যিক উপাদান ও অবস্থা সমাজে তখনো তৈরি হয়নি। সেই গাণ্ডব ভিত্তির অভাবেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ও সুসংহত কোন ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারে না, আর সেজন্যই তা মগ্ন হয়ে থাকে অলীকরাষ্ট্রবাদের দিবাশয়নে।

আমি মার্কসের এই কথাটিকে তাঁর অসামান্য চিন্তার মধ্যেও একটি অসামান্য রত্ন বলে মনে করি। কারণ অলীকরাষ্ট্রের ধারণাটি যদিও প্রাচীন এবং তার কল্পনিক আকৃতি পুরাকাল থেকেই বারবার চিত্রিত হয়েছে সাহিত্যে ও লোকগাথায় তবু কেবল প্রেটো ও রুসোর

কথা বাদ দিলে মার্কসের পূর্বসূরীদের মধ্যে যাদের চিন্তা দিয়ে রাষ্ট্রদর্শনের তাত্ত্বিক বনিয়াদ রচিত হয়েছে তাঁরা প্রায় সকলেই শুধু রাষ্ট্রের সুপরিণত ও সর্বাস্থে সম্পূর্ণ আদর্শ রূপটি সামনে রেখে তাঁদের বক্তব্য তৈরি করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র তো সমুদ্রফেন থেকে সদ্যোথিতা আহ্নেদিতির মত হঠাৎ নিখুঁত ইতিহাসনিরপেক্ষ মূর্তিতে আবির্ভূত হয় না। তার জন্মের ইতিহাস এক একটি শ্রেণির বা সমূহের সামাজিক সত্তা ও চেতনার উল্লেখ ও বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই পরিণত রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচয় ছাড়া যেমন কোন সমাজের রাজনৈতিক চেতনাকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তেমনি অপরিণত রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ সেই সমাজে প্রচলিত অলীকরাষ্ট্রবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত না হলে তার রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমগ্রভাবে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায় না। এই জন্যই টমাস মোর, সাঁ সিমঁ, ফুরিএ, কাবে, ওএন প্রভৃতির চিন্তাকে পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণির জন্ম ও বয়ঃপ্রাপ্তির ইতিহাসে উপক্রমশিকার মর্যাদা দেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের ইতিহাসেও নানা শ্রেণি ও সমূহের অপরিণত রাষ্ট্রচিন্তার— অলীকরাষ্ট্রবাদী চিন্তার নিদর্শন অনেক আছে। অন্যত্র যেমন আমাদের দেশেও তেমনি বিশেষ শ্রেণির বা সমূহের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এই চিন্তার মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে ও বাস্তব জীবনে সেই আকাঙ্ক্ষাকে সফল করা জন্য আবশ্যিক বনিয়াদ তখনো তৈরি হয়নি। ফলে অলীকরাষ্ট্রবাদের মধ্যে ঐ সব শ্রেণির বা সমূহের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যেমন সূচিত হয়েছে, তেমনি সূচিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় ইংরেজ রাজশক্তিকে হঠিয়ে দিয়ে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতার পরিণত করার অক্ষমতা। ঐ যুগের উচ্চনীচ উভয় বর্ণের অলীকরাষ্ট্রবাদেই আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতার এই দোটা বোঝা পড়ে। এই জন্যই উচ্চবর্ণের রাজনীতি সম্যক বোঝা সম্ভব নয় বক্ষিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’, ভূসেব মুখোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গলক ভারতবর্ষের ইতিহাস’, গান্ধীর ‘হিন্দু স্বরাজ’—এর সাহায্য ছাড়া। কারণ ভারতীয় উচ্চবর্ণের অগ্রণী যে বুর্জোয়া শ্রেণি সর্বোচ্চতা কামনা করেও তা আয়ত্তে আনতে পারেনি, ওই সাহিত্য আসলে তাদের সেই ব্যর্থতারই সাক্ষী। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতন্যের মধ্যে একটা অলীকরাষ্ট্রবাদী উপাদানের অস্তিত্ব আমার কাছে খুবই পরিষ্কার। এই উপাদানটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা না করলে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আশা করি কোন কোন তরুণ ঐতিহাসিক এই জটিল, দ্ব্যর্থময় ও একান্তই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভায় উজ্জ্বল করে

তুলনায় অদূর ভবিষ্যতে।

নিম্নবর্ণের চিন্তায়ও অলীকরাষ্ট্রবাদ ওইরকম দোটা ন্যায় এবং পরস্পরবিরোধী অর্থের মধ্যে বিভীর্ণ। একদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বাস্তব ও চৈতন্যে সেই আকাঙ্ক্ষা সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ও তজ্জনিত দুর্বলতা। একদিকে ঐতিহ্যবাহী বাঁশের কেদা, সিদো কানছর হাতে গড়া সাঁওতাল ফৌজ, ভারতের নানা স্থানে সারা ঔপনিবেশিক যুগ ধরে হঠাৎ এক একটি জঙ্গি সমাবেশকে উপলক্ষ্য করে গণ্যকবিনের জন্য বিদ্রোহীদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা—একদিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার এই নির্ভীক আত্মঘোষণা ও অপরদিকে ব্যর্থতা, পরাজয়, পলায়ন, হত্যাশা। আকাঙ্ক্ষা ও অসাধ্যতার ভাবমূর্তি হিসেবে তাই বিদ্রোহীদের অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রদর্শন কখনো কখনো তাঁদের পরোয়ানা, জবানবন্দি, গোয়েন্দা পুলিশ বা মিলিটারি রিপোর্টে তাঁদের কথার টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি মারফত আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব। তাঁরা নিরক্ষর, কোন বক্ষিম ভূসের গান্ধী তাঁদের হয়ে কলম ধরেননি, সুতরাং তাঁদের বক্তব্য কখনো তাঁদের নিজের ভাষায় শোনা যায় না। কিন্তু তাঁদের শত্রুপক্ষীয় সরকার-সাহসকর-জমিদারদের লেখা নানা বিবরণে ওই রাষ্ট্রচিন্তার রূপটিকে বারবারেই বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ নিম্নবর্ণ যখন ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তখন যারা ক্ষমতাবান তাদের গুণতে হয় নিম্নবর্ণ কি বলতে চাইছে, তা লিখে রাখতে হয় সরকারি বেসরকারি কাগজপত্রে।

এইসব সাক্ষ্য থেকে একথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে নিম্নবর্ণের আকাঙ্ক্ষা ও অসাধ্যতার এই দ্বন্দ্বই তাঁদের ধর্মভাবকে কায়ম করে রেখেছে। এইভাবেই অলীকরাষ্ট্রবাদের যেদিকটা আকাঙ্ক্ষার তা নিম্নবর্ণকে উৎসাহিত করেছে তার রাজনীতির গৌণত্ব ও মৌলিকতা নিয়ে জমায়েত হতে, আর যে দিকটা অসাধ্যতার তাকে বাধ্য করেছে সেই ও পারলৌকিকতার আশ্রয় নিতে। নিম্নবর্ণের চৈতন্যকে যখন আমরা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হব তখন যেন তার এই ধর্মাত্মী দোটা চরিত্রের গুরুত্ব ও গণিততা স্বীকৃতি পায় আমাদের গবেষণায়, আমাদের রচনায়।



তিতুমীর



বীরসাহিত্য



বিষয়বস্তু

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের দলিত সমাজের মধ্যে ইদানিং এক শ্রেণীর সমাজ সেবকের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে যারা আদা জল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন সমাজটার একটা হিত না করে ছাড়বেন না। সারা জীবনে এরা অনেক কিছু কীর্তি করেছেন, বাকি ছিল শুধু মানুষের জন্য হিত কার্য করা। এইবার সেটাই করে ছাড়বেন।

সমাজটা আমার বাপ-ঠাকুরদার সবজি ক্ষেত নয় যে ছাগল ঢুকলে লাঠি নিয়ে তেড়ে যাব। সমাজ রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবার। সমাজসেবা করবার অধিকারও সবার সমান। যে কেউ যে কোন শুভক্ষণে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সেবার সাগরে নেমে পড়তেই পারেন। বাধা সেবে কেন্ আশঙ্কক?

এমনিতেই এই সমাজের সেবা করার মানুষের চিরকালই বড় আকাল। উচ্চবর্ণের লোকদের তো এই বর্ণের লোকের সেবা নেবার শাস্ত্রীয় অনুমোদন আছে, নিচবর্ণের উচ্চ লোকেরাও এদের সেবায় এম.এল.এ., এম. পি., মন্ত্রী, স্পিকার হয়ে আর নিজের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকাতে পারেননি। সেই অবস্থায় নেই মামার চেয়ে কানা মামাকে খারাপ বলি কি করে?

হিন্দিতে একটা প্রবচন আছে—“যব জাগো তব হি সবেরা”। অর্থাৎ যখনই তোমার ঘুম ভাঙ্গবে ধরে নাও তখনই সকাল। ঘড়ির কাঁটার তখন কটা তোমার দেখবার দরকারই নেই। আরো ভালো করে বললে বলতে হয়—যখনই তোমার চৈতন্যোদয় হল তখনই যে কোন মহৎ কাজের শুভারম্ভের কাল। আর বিলম্ব না করে কাঁপিয়ে পড়।

তাই, সারাজীবন চোখ বুজে থাকার পর শেষ বয়সে শেষ ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে কেউ একটুখানি নড়েচড়ে যদি ওঠেন এবং একটা মোক্ষম কর্ম করে যেতে চান সেটা তো অতি উত্তম ব্যাপার।

সবটাই অশোকের কথা ভাবুন যার অঙ্গুলি হেলনে লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হত সে কি শেষ বয়সে নিজেকে বদলে নেয়নি? এই আধুনিক যুগেও তো কত চোর চিটিংবাজ অপকর্ম

কাজ ‘শান্তি চলুম’ বলে পেরুয়া ধরে নিয়েছে। তবে কিনা সন্দেহবাদীদের মনে প্রশ্ন আসা অতি স্বাভাবিক যে, ডাক্তার হলুম, বিজ্ঞানী হলুম, কবি হলুম বলে যদি তা না হওয়া যায় তবে শান্তি চলুম বা সমাজসেবক হলুম বললেই তা কি করে হওয়া সম্ভব? তাদের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে—না, হলুম বললেই হওয়া যায় না। হওয়া বা হয়ে ওঠা একটা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া এবং এই হয়ে ওঠার ইচ্ছাটা হওয়া দরকার একেবারে নিখাদ, আন্তরিক এবং নিঃস্বার্থ। কাজেই সদ্য সমুদিত সমাজসেবকদের কাছে বিনীত জিজ্ঞাসা সত্যি সত্যি কি এই ইচ্ছাটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন? নাকি এই ‘হলুম’ পিছনে কোন ‘হালুম’ উদ্দেশ্য আছে?

একটি অঞ্চলে কিছুদিন আগে কতিপয় লোকের ঠিক এইরকম সমাজ-ভাবনা চাণাড় দিয়েছিল। তারা হির করল যে এই মুহূর্তে হয়ে ওঠা সমাজ-ভাবনাকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে চৌরাস্তার মোড়ে বাবাসাহেবের একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক। এলাকার প্রায় আশি ভাগ লোক দলিত সমাজের। এদের প্রভাবিত করতে বাবাসাহেবের মত মোক্ষম অগ্র আর কি আছে? তারা একটা ভালো অংকের চাঁদা তুলে কর্মযজ্ঞে এগোতে লাগল।

এলাকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতারা আঞ্চলিক সমাজ-বিন্যাসের ও বোশাটোর প্রেক্ষায় মূর্তি-কেন্দ্রিক গণ উদ্‌যাদনায়, অনুমান করে নিতে কোন ভুল করে না যে আবেদনকর জন্মোৎসব পালন কমিটির মাধ্যমে আগামী দিনে এখানে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের বীজ বপন হতে যাচ্ছে যা একান্তই উচ্চবর্ণের আধিপত্য খর্ব করে।

তাই তারা কূটনীতির সহায়তা নিল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে কয়েকজনকে ছোটখাটো চাকরি, কাউকে বাজারে দোকান করার মত জায়গা আর কাউকে চোখ রাজানি দিয়ে নিস্তেজ করে ফেলল। এখন আর প্রথম বা দ্বিতীয় দলের সমাজ-সেবকরা সমাজের কথা বলে না। উক্ত রাজনৈতিক দলে আঞ্চলিক মেজবাবু-সেজবাবু হয়ে সুখেই আছে।

এটাই তারা চেয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলে কিছুতে কছে পাচ্ছিল না। সেই রাগে, মেগে, দুঃখে, হতাশায় সমাজ-সেবক বনে গিয়েছিল। বৌমার ওপর রাগ করে শাশুড়ি-মাকরণ বৃন্দাবন ধাওয়া করে না? এর পিছনে ধর্ম-কর্ম নয়, কাজ করে ক্ষোভ, ক্রোধ। গত পাঁচ ধরে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনলে রাগ গলে জল। এখন শাশুড়ি বড় আরামেই আছে।

আমি মশাই ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেখে সেখে চমকাই। আজকের দিনে রাজনীতি আর সমাজসেবা—যদিও শব্দ দুটো সমার্থক হওয়া উচিত ছিল কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। এখন রাজনীতির মানে গরম গরম বক্তৃতা, ভোটে দাঁড়ানো আর বিরোধীদের ভেদানো। আর সমাজসেবা মানে যে কি অশুভিষ তা কে জানে। বর্তমানে এই দুটো বিনা মূলধনে মত্ত বড় ব্যবসা। আর এক দলকে এই আলোচনায় রাখা যেত — তারা হলেন গুরুজি-বাবাজি-গোসাইজি-মাতাজি। ব্যবসা-বুদ্ধিতে ওনারাও কম যান না।

যান ভানতে শিবের গীত দরকার নেই, ফিরে আসি সমাজ-সেবায়। বলেছিলাম সমাজসেবা আজকাল একটা ব্যবসা। বিশ্বাস না হয় তো একটু চোখ ফেরান, দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে ব্যাঙের ছাতার মত অগুনতি সমাজসেবী ফান্ডেড সংস্থা যার আবার একটা ইংরাজী নাম আছে 'এন.জি.ও.'। এইসব এন.জি.ও.-র কাজ হচ্ছে 'অনলস' সমাজসেবা করে যাওয়া। এদের সাজানো-গোছানো অফিস, কম্পিউটার-টেলিফোন-চাপরাশি-আদালি-ছেটি বড় অফিসার থাকে। এদের কেউ এক-একটা এলাকা ভাগ করে নিয়ে গোমুখু জনগণকে হাতে-কলমে শেখান—মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন, পোলট্রি বা শূকর পালন করে লাভবান হওয়া যায়। কেউ বোধান নিরক্ষরতার কুফল আর কেউ ব্যাখ্যা করেন যোগ সাধনায় নিরোগ হবার পদ্ধতি। এর জন্য প্রয়োজনে গান-নাটক-বক্তৃতা-নাচ যা যা দরকার সব করেন।

দেশী এবং বিদেশী লক্ষ-লক্ষ টাকার খেলা চলে এই সমাজসেবাকে কেন্দ্র করে। যে কোন একজন এইরকম সেবকের বাড়ির-গাড়ির-বিশেষ ভ্রমণের ব্যয়-বহর দেখলেই আপনার আমার মত লোকের চোখ চড়কগাছ হয়ে যাবে।

আমাদের এই দলিত সমাজের ঘি-দুধ-সর-মাখন লোকজনেরা এইসব মহাপুরুষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত-প্রভাবিত-উত্তেজিত হয়েই সমাজ নামক অবাধের সেবা করতে ঝাঁপাচ্ছেন কিনা তা কে বলবে? নব আবির্ভূত এইসব স্বঘোষিত সমাজসেবকদের সন্দেহের সব চেয়ে বড় কারণ তাদের পূর্ব পরিচয়। এরা কারা?

এরা প্রায় সবাই একদা ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী।

জনগণের যে অকর্নীয় দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন তার একটাই কারণ নির্মম-নির্বিকার পাহাড়-প্রমাণ শোষণ। যতদিন না মানুষ শোষণের থাবা থেকে মুক্তি পাচ্ছে, অভাব-অনটন থেকে মুক্তি নেই। ভারতে এই শোষণ-ব্যবস্থা চলছে বর্ণ-ব্যবস্থাকে নির্ভর করেছে।

আমি মশাই ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেখে সেখে চমকাই। আজকের দিনে রাজনীতি আর সমাজসেবা—যদিও শব্দ দুটো সমার্থক হওয়া উচিত ছিল কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। এখন রাজনীতির মানে গরম গরম বক্তৃতা, ভোটে দাঁড়ানো আর বিরোধীদের ভেদানো। আর সমাজসেবা মানে যে কি অশুভিষ তা কে জানে। বর্তমানে এই দুটো বিনা মূলধনে মত্ত বড় ব্যবসা। আর এক দলকে এই আলোচনায় রাখা যেত — তারা হলেন গুরুজি-বাবাজি-গোসাইজি-মাতাজি। ব্যবসা-বুদ্ধিতে ওনারাও কম যান না।

অন্যদিকে যখন নিরাকার সরকারও তেমনই আকারহীন। মন্দিরের পাণ্ডাকে দেখে যেমন ইশ্বরের কণ্ঠস্বর অনুভব করা যায়, সরকারি কর্মচারির কাছ থেকে পাওয়া যায় সরকারের নীতিগত ন্যূনা। এই রাষ্ট্রীয় শোষণ-সমন-পীড়ন-শাসন যাদের জন্য স্টীম রোলারের গতি লাগে তাই তারা এই হচ্ছে সরকারি কর্মচারি। তা সে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, আই.এ.এস. অটি.পি.এস. বা পঞ্চায়েত প্রধান-ই হন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওই ব্যবস্থার সাথে যুক্ত।

এইসব শোষণ-শাসন বা দায়-দায়িত্ব দীর্ঘকাল সম্পন্ন করবার পর, মাসে মাসে প্রচুর মাটি নে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপরি দু-হাতে কমিয়ে, পেনসন, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিশ্চয় নিগাপত্তায় জীবন সমর্পিত হওয়ার পর এবং বয়সের নিরিখে অক্ষম-অকর্মণ্য পেনশনায় সরকার অবসর দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার পর অনেকে বিষম ইপ্সিয়ে ওঠেন। ততশায় ভোগেন। সময় কাটানো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাবক-চাটুকারেরা নেই। তাই এনে বামে স্যার স্যার সছোদন নেই। জীবন তখন যেন নীরস মল্লভূমি।

তখন তাদের কেউ কেউ ছুটে যান কোন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের কাছে। নতজানু হয়ে ভিক্ষা করেন যদি কোন কর্তৃত্বকারি এবং সম্মানজনক পদ পান। মন্ত্রী, এম.পি. চাই না, মিনিস্ট্রপক্ষে কোন ওয়ার্ড মেম্বর বা পাড়া কমিটির প্রেসিডেন্ট। আবার কেউ কেউ লাওয়া করেন রামকৃষ্ণ মিশন কচুয়া ধাম, দেওঘর অথবা হুথিকেশে মহেশ বোণীর আশ্রমে। উভয় স্থান থেকে ঝাড় খেলে চাগাড় দিয়ে ওঠে সমাজসেবা। ঘোষণা করে দেন 'আজ থেকে আমি চিন্তা এবং মননে, জ্ঞান এবং কর্মে সত্যিকারের সমাজসেবী। আমার মশাই ইহকাল এবং অনন্ত পরকাল ব্যয় করা হবে সমাজের দরিদ্র নারায়ণের সেবায়, একটানা মঙ্গল কামনায়।'

আমি আমার সমাজের বাইরের তথাকথিত উচ্চবর্ণের কারও বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। কেন বলব? বলে কি লাভ? তারা তো চিরকাল আমাদের মাথায় কাঁঠাল বেশে কোয়া খেয়ে আসছে। যতদিন আমরা শিক্ষিত-সচেতন-সংগঠিত-সংস্কারমুক্ত-নিপামনমনস্ত হতে না পারব ততদিন তারা তা করেই যাবে। কারও সাধ্য নেই ঠেকাবার। নামাণ আক্কেল একমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যারা আমার নিজের সম্প্রদায়-জাতি-গোষ্ঠি-

সমাজের। যারা একটু দরদী, মনোযোগী, আন্তরিক হলে উচ্চবর্ণের নাগপাশ ছিড়ে আমরাও একটা ইতিহাস রচনা করতে পারতাম।

আমাদের সমাজে যোগ্যতা-মেধা-প্রতিভার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সেইসব মেধাসম্পন্ন লোক তার যা কিছু উৎকর্ষতা ব্যয় করেছেন নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য। নিজের লোক-নিজের লোকের জন্য কিছুই করেননি। এটা সমাজের প্রতি একটা বেইমানি। আমার আক্রমণ ওইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লোভী, নির্দয় বেইমানদের উপর।

আজ তেমনি যারা কোমর বেঁধে আমাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছেন সেইসব নবহিতৈষীদের কাছে জিজ্ঞাসা— দলিত সমাজের ‘হিত’ করার দিকি কে আপনাদের দিয়েছে? দলিতজনের হিত করা ছাড়াও তো জগতে আরও কত কিছু করণীয় আছে, তা সত্ত্বেও সবকিছু ছেড়েছুড়ে আপনারা আমাদের দিকে দৌড় লাগালেন কেন? চোখে তুলসি পাতা দেবার মিনিট কয়েক আগে এমন উচ্চাদের চেতনা চাগিয়ে ওঠার কারণ কী, কীসের লক্ষণ?

মোটাই মাইনের চাকরি বাগিয়ে সর্বসুখ ভোগের পর, শরীর যখন অচল, পৃথিবীকে দেবার মত আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই, আছে মাত্র গোনানুশুন্তি গোটা কয়েক নিঃশ্বাস, তখন এই সেবা নামক আত্মপ্রবঞ্চনা না করলেই কি নয়?

দক্ষতা বা যোগ্যতা শব্দ দুটো নিয়ে সর্বকালের বিতর্ক ছিল এবং আছে। এই দুই শব্দ নিয়ে বর্ণবাদীরা সর্বদাই ঢাক পেটায়। সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতা বলে যিনি উচ্চ শিখরে উঠেছেন তাদের বিরুদ্ধে কারোরই কিছু বলার থাকতে পারে না এবং সেই উচ্চতার আনুকূল্যে যা কিছু তিনি আহরণ করেছেন তা তার নিজের। কেউ তা থেকে কানাকড়ি দাবী করতে পারে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার সমযোগ্যতার অথবা যোগ্যতার ব্যক্তিকে পিছনে ফেলে সংরক্ষণের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেছেন এবং সামাজিক ও মানবিক গুণাবলি থেকে নিজেকে বিমুক্ত করেছেন সেই দুরাঙ্কাকে ক্ষমাঘোষা করা যায় কী?

উচ্চবর্ণের মধ্যে অযোগ্য, অদক্ষ মানুষ যে নেই তেমন তো নয়, তাদের মধ্যেও বহু নিবেদী আছে কিন্তু তাদের তো মামা আছে। মামার আড়ালে তারা নির্বিঘ্নে জীবন চালিয়ে

যায়। মামাদের প্রতি তাদের আনুগত্য-ভালবাসা সীমাহীন। মামাদের জন্য মরণপণ লড়াই করে। দলিতদের তো মামা নেই। তাদের মামা ঐ সংরক্ষণের আইন। কিন্তু সংরক্ষণ প্রথার প্রতি ভাগ্যেদের আনুগত্য নেই। ভালবাসা নেই। মামাকে অস্বীকার করবার সুলুক খোঁজে তারা। তাদের মুখে লম্বা কথার তুবড়ি। যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের থেকে তিনি যে অনেক উত্তম সে কথা জানান দেন নিরন্তর।

আমার চেনা জানা এমন কয়েকজন বড় চাকুরে আছেন যারা ওই সাংবিধানিক রক্ষা কবচটির সহায়তা না পেলে চাকরি তো বহু দূরের কথা মুদির দোকান করে পেট চালাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সেইসব অযোগ্য বিলাস-ব্যসনে জীবন উপভোগ করতে পেরেছেন যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার দৌলতে সেই ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে সে বা তার চৌদ্দ পুরুষের কেউ এককোঁটা ঘামও ঝরায়নি। সে যদি কেউ করে থাকেন তো তিনি হচ্ছেন বি.আর. আশ্বেদকর। প্রাণপাত করেছেন তিনি দলিত অনগ্রসর জাতিগুলোকে স্বাবলম্বী করতে।

আর আজীবন প্রচেষ্টার সবটুকু সুফল আজ একদল আত্মসুখ-সর্বস্ব’র পাতে গিয়ে পড়েছে। তারা চেটেপুটে সবটুকু খাচ্ছে আর নিজের সম্ভান-সম্মতির খাবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখে যাচ্ছে। যত কমসংখ্যক লোক শিক্ষিত হবে ততই তাদের মৌরসী পাট্টা অক্ষয় হবে।

উচ্চবর্ণ, বর্ণের কারণেই যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে তারা ছেলেমেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবে। প্রাথমিকে ইংলিশ থাকে বা না থাকায় তাদের কোন অসুবিধা নেই। আর যারা দলিত অথচ বিদ্বান তাদেরও কোন সমস্যা হবার কথা নয়। তারাও ওই একই পথ নিতে পারবে। আর পিছিয়ে যাবে বিত্তহীন দীন-দরিদ্র বিশালসংখ্যক দলিত মানুষ যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। আর তা হলেই সংরক্ষণের কোটায় চাকরি পাবার দাবীদারের সংখ্যা হ্রাস পাবে। লাভবান হতে থাকবেন তারাই যারা ইতিপূর্বে হয়েছেন।

বাবাসাহেব কিন্তু দলিত সমাজের মধ্যে আর একদল পৈতৃহীন ব্রাহ্মণদের আকাশছোঁয়া বাড়-বাড়ন্তের জন্য প্রাণপাত করেননি। তিনি বড় আশা করেছিলেন সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে যারা উপরে উঠবে তারা তার নিজের ধাপের মানুষগুলোকে টেনে তুলবে। সে স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। শেষ জীবনে তাই বড় আক্ষেপ করে বলেছিলেন—‘এইসব শিক্ষিত মানুষরা আমাকে ঠকিয়েছে সবচেয়ে বেশি’।

শত্রুকে যদি সনাত্ত করা যায় সে তত ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারবে না, কিন্তু সে যদি হয় অ-সনাত্ত বা 'আপনজন' তাহলে তাকে ঠেকানো মুশকিল। এইচ.আই.ভি. ভাইরাসের মত। সব সে ধ্বংস করে দেয়। আশ্বেদকরবাদও আজ সেই অদৃশ্য ভাইরাসে আক্রান্ত। আশ্বেদকরের নামাবলি জড়িয়ে যারা সমাজসেবা করতে আসছেন তারা মূর্খ নন। তারা খুব ভালোভাবেই জানেন—আশ্বেদকরবাদী সেজেই আশ্বেদকরবাদকে চূর্ণ করা সহজ কাজ এবং নিজেদের আখের শুছানো সম্ভব।

একজন লোককে জানি যার খুব শখ ছিল বাঘ শিকার করে তার পেটে পা তুলে দিয়ে ফোটো তোলাবে। কিন্তু তার না আছে বন্দুক, না আছে পোষা বাঘ। বড় কষ্ট ছিল তার মনে। কিছুদিন আগে ট্রিক ফোটোগ্রাফির অশীর্বাদে তার মনোকষ্ট দূর হয়ে গেছে। বাঘের মুখোমুখি না হয়েও এখন সেওয়ালে ঝুলছে তার বাঘের পেটে পা তুলে দেওয়া ফোটোশিল্প। যা সে নয় তা বলেই খ্যাতি পাচ্ছে লোকের কাছে।

ওইসব আশ্বেদকরবাদীদের বাড়িতে গেলে 'ট্রিক ফোটোগ্রাফি'র মায়াবী যাদুতে কথাটি প্রমাণ করে দেবেন তিনি কি ছিলেন আর কি আছেন। কিন্তু যা আছেন, সেই জীবনচর্চার ক্ষেত্রে কোথাও কোন মানবতা উদারতার ছিঁটেফোঁটাও পাবেন না।

বাবাসাহেব যা দেখেছিলেন আমরাও এখন তা দেখতে পাচ্ছি। যে উপরে উঠেছে সে আরও উপরে ওঠার জন্য ব্যাকুল। যেহেতু উপরের কোন সীমা-পরিসীমা নেই তাই এক ধাপ ওঠার পরই আর এক ধাপের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়ছে, এর জন্য সে নৈতিক-অনৈতিক যে কোন পথ-পন্থা গ্রহণে দ্বিধা-স্বন্দ্বহীন। তার আর নিচের দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। অবসর গ্রহণের পরেও। কে কীদছে, কে পিষে যাচ্ছে পায়ের তলে সবকিছুতে সে উদাসীন। এম.এল.এ, এম.পি. হওয়ার স্বপ্নে মগ্ন।

বাবাসাহেব বলেছিলেন পে ব্যাকটু সোসাইটি। সমাজ থেকে তোমরা অনেক পেয়েছ অনেক নিয়েছ, অকৃতজ্ঞ হয়ে না, তার কিছু অস্ততঃ ফিরিয়ে দাও। কিন্তু এরা এমন কৃতজ্ঞ, এমন নিমকহারাম যে পরোপকারি সেই দলিত-দরদির কথা কানেই নেয়নি। এরা বেমালুম ভুলে গেছে সামাজিক দায়-দায়িত্বের কথা এবং সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী অপদার্থগুলো সমমনস্ক, সমসংস্কৃতির আর কিছু অপদার্থকে একত্রিত করে গড়ে তুলেছে একটা নতুন শ্রেণি। যারা সমাজের কাছে সরকারের কাছে কিছু প্রাপ্তির বেলা পরিচয় দেয় সিডিউল কাস্ট বা দলিত বলে কিন্তু জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মনুবাদীদের চেয়েও হৃদয়হীন-স্বার্থী।

খুব বেশি দিনের কথা নয়— যখন বামপন্থীদের আন্দোলন সবে শুরু জমি পাচ্ছে, তখন তাদের কর্মীদের মধ্যে কি তৎপরতা, ত্যাগ-কষ্ট স্বীকার আর সেবা ভাবনা! মাসের পর মাস পুলিশের তাড়নায় পালিয়ে, না খেয়ে থেকেও মনোবল কি অটুট! কি আস্থা আদর্শের জন্য আহ্বোৎসর্গের! তখন কারখানার একজন মজুর মাইনে পেতো মাসে একশো দশ কি কুড়ি টাকা। ওই টাকায় কারও বাড়িতে দুবেলা উনুন জ্বালা অসম্ভব ছিল। তবুও মাইনে থেকে দুটো টাকা পাটি তহবিলে সেবার জন্য ঠিক সরিয়ে রাখতো। কোন ভুল হত না। এইরকম নিষ্ঠা মধ্যপ্রদেশে আর.এস.এস. কর্মীদের মধ্যেও দেখেছি।

আপনি ওই দুই দলের কাউকে পছন্দ না করতে পারেন, পছন্দ বা অপছন্দ ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু ওদের ক্যাডারদের দলের প্রতি যে দায় বা দরদ সেটাকে অস্বীকার করবেন কি করে? এই দরদ আর দায় ছিল বলেই শূন্য থেকে শুরু করে ওরা মহাশূন্য ছুঁয়ে ফেলেছে।

মার্কসবাদ, আশ্বেদকরবাদ, কোন মতবাদই কোন সঞ্জীবনী মন্ত্র নয় নয় যে আওড়ালেই অভীষ্ট ফল দেবে। মতবাদকে প্রয়োগের ধরাতলে নামিয়ে আনতে পারলে তবেই তার সফলতা এবং তার বাস্তব প্রয়োগের জন্য চাই একদল একনিষ্ঠ জঙ্গী কর্মী। যারা উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মারা এবং মরা কোন কিছুতে পিছু হটবে না। আমাদের দলিত সমাজে তেমন কর্মী কই? নেই। তেমন কর্মীও নেই, কর্মী গড়ার কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন নেতাও নেই। যারা নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা রাখত তারা কেন সেই ভূমিকা নেয়নি তার উত্তর তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, একদল প্রাণবান তরতাজা দুরন্ত ছেলে ইলানিং সাপ্লাই, ঠিকাদারি, প্রমোটারি, দালালি করে বেড়াচ্ছে! এটাও ঠিক যে কেউ কেউ তোলাবাজি, অপহরণ, ডাকাতি করছে। কিন্তু কিছুকাল আগেও যুবকদের মধ্যে যে প্রবণতা ছিল অর্থাৎ রাজনীতি করা, সেদিকে খুব একটা কেউ এগোচ্ছে না। এর কারণ কি?

কারণ আর কিছু নয়, তাদের মন-মস্তিষ্কে খুব সাবধানে এই কথাটা ভরে দেওয়া হয়েছে যে, যে শ্রম দিয়ে তুমি দেশের দুঃখ, তোমার কাছের মানুষের দুঃখ দূর করবে তার লাখ ভাগের এক ভাগ খরচ করে নিজের জীবন পরিপূর্ণ করে ফেলতে পারো। বনের মোষ বনেই থাকুক তোমার ভাড়িয়ে কাজ নেই, নিজেকে দেখো।

আমাদের সমাজকে যারা নেতৃত্ব দিতে পারতেন এই সামান্য ব্যাপারটা তারাও বোঝেন।

কথায় বলে আগের হাল যেদিকে যায় পরের হালও সেইদিকে চলে। এমনিতে আমাদের সমাজে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম। যে দু-চারজন শিক্ষিত হন তারা পূর্বতনদের পন্থা অনুসরণ করে চলে। এইজন্য দলিত সমাজের মধ্যকার কাউকে নিজ সমাজের উন্নতির জন্য কোন কষ্টবীর্য করার করতে দেখা যায় না।

আমি বরং উন্টোটিই দেখি।

পূর্বলিয়ার আদিবাসী শবরদের দুঃখে কাতর হয়ে ছুটে যান বৃদ্ধা মহাশ্বেতা দেবী। দলী রাজহরার গোণ্ড, মুরিয়া, ছত্তিশগড়িসের জীবন যন্ত্রণার ভার লাঘব করতে প্রাণ সেন শংকর গুহ নিয়োগী। মুরিয়া মারিয়াদের রাষ্ট্রীয় শোষণ থেকে রক্ষা করতে জেল খাটেন ব্রহ্মদেও শর্মা। নর্মদার তট থেকে উৎখাত হওয়া আদিবাসীদের পুনর্বাসনের দাবীতে জল সমাধিতে প্রাণ ত্যাগের সঙ্কল্প নেন মেধা পাটেকর। বিনায়ক সেনের কথা ভোলা যায়?

যাদের নাম লিখেছি তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। কোন না কোন সময়ে দু'পা একসাথে হেঁটেছি। তাদের যে দরদ রে আন্তরিকতা তা দলিত সমাজের কারও মধ্যে পাইনি। আমি যা দেখেছি তা থেকে ধারণা হয়েছে আমাদের সমাজের অনেকে যদিও আর্থিক দারিদ্র্য দূর করতে সফল হয়েছে কিন্তু সঙ্কম হয়নি মানসিক দুর্ভিক্ষ দূর করতে। আগে অভাব ছিল খুব কম, তখন পেটের ভাত, পরিধানের পোষাকের জন্য কঁাদতো। এখন যাদের এক কোটি আছে পাঁচ কোটি কেন নেই সেই শোকে কঁাদে। এই কালার শেষ কোথায় তা কে জানে?

যে মানুষের মাত্র ভাতের বিদে তার ঘরে এক কিলোর জায়গায় পাঁচ কিলো চাল পৌঁছে গেলে সে নিজে খাবে আর কাউকে ডেকেও খাওয়াবে। এটা একটা সু-সংস্কৃতি। কিন্তু বার বিদে পাঁচ-দশ-পঁচিশ কোটির, এক কোটি তো তার কাছে অতি সামান্য। তা থেকে অন্যকে মন থেকে কি করে কিছু দেবে? সে যে আরও অনেক চায়। বার চাওয়ার সমাপ্তি হয়নি তার দেবার শুরু হতে পারে না।

মহাজনরা বলে গেছেন অগ্নি সত্য বলা অনুচিত। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন, শিষ্টজনোচিত সংলাপের আড়ালে নিজের কাপুরুষতাকে ঢাকা দেবার শিল্পটা আজও আমি ঠিক আয়ত্ত্ব করে উঠতে পারিনি। তাই অগ্নি হলোও সত্যকে ত্যাগ করা যাবে না। আগে ভাগে বলে রাখি আমি ঠিক ভদ্র-সত্য-শিক্ষিত বলতে বা বোঝায় সেই দলে পড়ি না। বর্তমান সময়ে ভদ্র-অভদ্রের মূল্যায়ন হয় যে মানদণ্ডে সেই আর্থিক সঙ্গতিতে আমি

নাগাধন ৭৭সহ। বেঁচে-বেড়ে উঠেছি ফুটপাথ-রেল স্টেশনে। লোকে আমাকে রিক্সাওয়ালা বলেই চেনে। অন্য যা পরিচয় তা তার পরে—। এই অবস্থায় কেউ কি নিজেকে ভদ্র বলে দাবী করতে পারে? আমি করছি না, তবে, তবু যদি আপনি আমাকে ভদ্র বলতে চান বলতে পারেন। সেটা আপনার মহানুভবতা। যা বলছিলাম—যাদের চাওয়ারই কোন নিশ্চয়ি হয়নি তারা দেবে কি করে? এই কারণে এরা অন্য অপর তো দূরের কথা যারা তাদের আশেপাশে কাছে কাছে রাতদিনের অধিকাংশ সময় বছরের পর বছর ধরে ব্যয় করে সেই সব হতভাগাদের জন্যও অনুকম্পা দেখায় না।

যদি পারেন এদের একবার জিজ্ঞেস করুন, আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে ছয়-সাত ঘণ্টা সময় কাটানোর মূল্য বাবদ যে পরিমাণ অর্থ নিয়েছেন এবং আরও পাওয়া উচিত বলে চিৎকার আন্দোলন করছেন, সেই আপনি আপনার সেবায় নিযুক্ত বাড়ির জ্বাইভার কি চাকরদের বারো-চোদ্দ ঘণ্টা খাটিয়ে নিয়ে কতটুকু পারিশ্রমিক দেন? তা কি তার ঐকনধারণের পক্ষে যথেষ্ট? এইসব পেশায় যারা নিযুক্ত তারা কেউ উচ্চকুলোদ্ভব নয়, সবাই নমঃ, পোদ, কাওরা, বাগদি, জেলে বা অন্য কোন নিম্নবর্গ। তবে তাকে বঞ্চিত করার বেলা আপনার এবং সেই কা-বা-ব দের একই অবস্থান কেন?

দেখুন তাদের কাছে কি জবাব পান।

আমার মা বাবু বাড়ি বাসন মাজত, বাপ খাটতো জনমজুর। আমার বাল্যকাল কেটেছে চাকরবাকর খেটে। নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, উপযুক্ত পারিশ্রমিক তো বহু দূরের ব্যাপার, এত বাড়িতে এইসব হতভাগাদের একটা ভালো টিফিনও দেয় না। রাতের বাচা পচা-বাসি-এঁটোকাটা দিয়ে দায় সারা হয়। প্রত্যন্ত এক গ্রামে কেমন আছে আপনার জ্যাঠাতুতো-শুড়তুতো ভাইয়েরা বা তাদের পুত্রকন্যারা?

কেন এমন হল? কেন এমন হয়? এমন হবার তো কথা ছিল না! আমরা তো আমাদের সমাজের মধ্যে যারা শিক্ষিত-ভদ্র-সচ্ছল হয়ে উঠেছে তাদের কাছ থেকে একটু মানবিক মগনভূতিশীল ব্যবহার পাবার আশা করেছিলাম। তারাও কেন 'ওদের' মত হয়ে গেল?

সত্যিকারের ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো সহজ। কিন্তু যে জেগে ঘুমায় তার ঘুম ভাঙ্গানো ৭৬ কঠিন। আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু যাদের উদ্দেশ্যে তারা কেউ বোকা বা মূর্খ নন। সবাই সব জানেন, বোঝেন। তাদের নামের পাশে কত বড় বড় ডিগ্রি-ডেজিগনেশন। মনের তাকে থান ইঁট তুল্য কত কেতাব। তারা তাদের উকিল যুক্তির মারপ্যাচে প্রমাণ

করে দেবে যে তারা যথেষ্ট মানবিক, উদার, সংবেদনশীল। হরির লুটের মত দুই হাতে বিলান স্বজাতি প্রেম। দয়া, করুণা আর প্রেমের প্রতিমূর্তি বুদ্ধ পর্যন্ত তার তুলনায় বামন।

কিন্তু বাস্তব যে বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

একবার বাদশাহ আকবর একটা সাদা কাগজে দুটো দাগ টেনে কাগজটা তিনি বীরবলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, বড় দাগটা ছোট করে দাও তো। বুদ্ধিমান বীরবল কলমের আঁচড়ে ছোট দাগটাকে টেনে লম্বা করে দিলেন। অমনি বড় দাগটা ছোট হয়ে গেল।

এটাই জগতের চিরকালীন নিয়ম। যে একবার বড় হয়ে গেছে তাকে যদি ছোট করতে হয় তাহলে ছোটকে বড় বানাও।

বামুন-কায়েত-বদিরা বহুকাল ধরে ধনে, মানে, জ্ঞানে, ক্ষমতায় বড়। ছলে-বলে-কৌশলে একবার যখন তারা খুঁটি গেড়ে ফেলেছে আর তা ওপড়ানো যাবে না। আপনি তাদের প্রাণ খুলে গাল দিতে পারেন, তাতে তাদের কিছু হেঁড়া যাবে না। আপনি সভা-সমিতি গড়তে পারেন, বড় কোন হল ভাড়া করে সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারেন। ফল ওই একই। আপনি দিত্তা-দিত্তা কাগজে সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখতে পারেন। কিন্তু পণ্ডিত তা করছেনও। তাতে যে একেবারে ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে আমি তা বলছি না। কোন দর্শন প্রচার, কোন সংগঠন প্রস্তুতির কাজে, চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানে কাগজ-কলমের প্রয়োজন। তবে আমাদের সমাজের ক'জন বা লিখতে-পড়তে জানে? যারা লিখতে-পড়তে জানেন তাদের ক'জন বা 'শিক্ষিত'? যারা শিক্ষিত তাদের ক'জন বা দলিত সাহিত্য পড়েন? ক'জনই বা বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজেদের মঙ্গলের পথ বেছে নিতে পারেন? তাই এক কষ্ট করে লেখা প্রবন্ধাদির পরিণতি হয় মরুভূমিতে বীণা বাজানোর মত।

সবাই না বুঝলেও কোন কোন পণ্ডিত এটা বোঝেন যে এসব করে বিশেষ কিছু হবার নয়। মানে দলিত সমাজের কিছু হবার নয়। কিন্তু তার নিজের বেলার কিছু কিছু হয়।

কি হয়?

এই হয় যে কিছু হাততালি মেলে, ফুলের মালা মেলে, কিছু সুনাম হয়, সে নাম তাকে শিক্ষিত মহলে সম্মানীয় করে তোলে। প্রকৃত নেতা হবার গুণ না থাকলেও কিছু লোক নেতা হবার, এম.পি./এম.এল.এ হবার বাসনার গোড়ায় ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখেন।

আমাদের মানুষদের ছাপার অক্ষরের প্রতি বিশেষভাবে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটি প্রকাশিত হবার প্রতি একটা অদ্ভুত মোহ আছে। মোহ আছে যা বাতিল বা দুর্বোধ্য তার উপরেও। সেই বেদের কাল থেকে এটা চলে আসছে। এইজন্য বিয়ে-শ্রাদ্ধ-পূজা পার্বণে খানিকটা অংক মন্ত্র আওড়ানোর দরকার পড়ে। ওই একই কথা বাংলায় অনুবাদ করে দিলে ভক্তি হওয়া হয়ে যাবে।

আমাদের সমাজের শিক্ষিত লোকেরা এই ব্যাপারটা জানেন। এই কারণে পাঁচ পণ্ডিত একত্র হলেই একটা পত্রিকা বের করে। তাঁদের যা কিছু সমাজহিতৈষণা সবকিছুর আবর্তন হয় পত্রিকার মাধ্যমে। রামবাবুর লেখা পড়েন শ্যামবাবু। শ্যামবাবুর লেখা পড়েন রামবাবু। একে অপরের প্রশংসায় রত হন। দলিতদের পত্র-পত্রিকা কিছু কম নেই। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষ্ট্রিমাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক। নতুন নতুন গজাচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে আতুড় ঘরেই। শুনি অধিকাংশই বেঁচে আছে অস্ত্রিজেনের নলের কুপায়। কোনদিন ভেবে দেখা হয়েছে কি কেন এমন হচ্ছে?

এসব মস্ত মেকি আর ফাঁকি দিয়ে ঠাসা। এর কোনখানেই সত্যিকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নেই। জনসংযোগ নেই। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের টান নেই। যে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের অক্ষর জ্ঞানই নেই তাদের জন্য পত্রিকার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আর যাই বরফ সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে না।

যদি সত্যিই তাদের স্ব-শ্রেণীর মানুষের সামান্যতম উন্নতি করার ইচ্ছা থাকে তবে তাদের সুরম্য প্রাসাদ থেকে নেমে আসুন নিচে। লেখা, বক্তৃতা চলুক, তার সাথে পায়ে পায়ে পৌঁছে যান কোন বস্তি, খাল পাড়, রেল কলোনি কিংবা কোন অস্ত্রপন্ন পল্লীতে। বেছে বার করুন দশটা দরিদ্র অথচ প্রতিভাবান ছেলেমেয়েকে। ভার নিন তাদের শিক্ষিত-সচেতন করে তোলার। লেখা হোক তাদের কথা। তাদের জীবন-যন্ত্রণার কথা, নিষ্কৃতির পথনির্দেশ।

শিক্ষিত হয়ে গেলে ওই দশজন আগামী দিনে শতজনকে শিক্ষিত করে তুলবে। শতজন শত সহস্রজনকে। শিক্ষা-বীক্ষা, বিদ্যা-জ্ঞানে উন্নত হয়ে উঠলে জাতি আপনা-আপনি বড় হয়ে যাবে। আজ যারা বড়, পড়ে থাকবে পাহাড়ের পাদদেশে মাটির ঢিবির মত।

কাগজটা কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু অসম্ভব মোটেই নয়। বস্তার জেলার জঙ্গলে গিয়ে দেখেছি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা দূর-দুর্গম বনে গিয়ে বনবাসি কল্যাণ

আশ্রম নামে ইচ্ছুল করে আদিবাসী বাচ্চাদের লেখা-পড়া শেখাচ্ছে। বলাবাহুল্য সে শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের জয় ঘোষণা।

আপনাকে আপনার নিজের শিক্ষায়, নিজের জীবনদর্শনে নিজের লোকদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আন্তরিকতা সহকারে তা যদি আপনি না করতে চান তবে আপনার সমাজসেবাকে প্রবলভাবে সন্দেহ করি।

এই অধম একজন নগন্য লেখক। পত্র-পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে এবং একটা গল্পের বই যখন আছে লেখক বলে দাবি করা নিশ্চয় অন্যায্য হবে না।

তাই হে ‘সমাজসেবক’ বন্ধু আপনাকে আজ স্পষ্ট কঠে ঘোষণা করতে হবে আপনি কি রাজী আছেন অবস্থা এবং অবস্থান বদল করতে? পারবেন কি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত ভবন থেকে নিচে নেমে এসে রৌদ্রদগ্ধ নিঃশ্বাস মানুষের মাঝে দাঁড়াতে? পারবেন কি বহু মমতায় সম্বিত অর্থভাগ্যের সমাজের নবজন্মের কাজে শূন্য করে দিতে? রুটি-কাপড়া আর মকান-এর ব্যবস্থা তো আপনার পাকা হয়ে আছে। তবে আর চিন্তা কেন?

যদি পারেন, তাহলে আসুন, স্বাগত আপনাকে। প্রণাম আপনার মানবিক কর্তব্য বোধকে। আর যদি শুধু মুখ দেখিয়ে উদ্ধারকর্তা মহামানব নেতা, অবতার হতে হাজির হয়ে থাকেন তবে আর একটু ধৈর্য্য ধরুন। দাঁউ দাঁউ চিতার আগুন দেখার পর আমরা আপনাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নেবো, ধূপ-ধুনো, মালা-চন্দন দেব। তাতে অবশ্য জাতির কোন কল্যাণ হবে না। সে না হয় না হোক, আপনার কি? জাতি হাজার বছর অপেক্ষায় আছে। আরও না হয় হাজার বছর অপেক্ষায় থাকবে! ধান্দাবাজ রাজনেতার লম্বা বকুনি, জালিয়াত গুরু-গৌসাইয়ের সবজাস্তা বাণী আর উচ্চবর্ণের লোকজনের ঘৃণা আর অবজ্ঞা সহ্য করবে।

আর না হলে পথের ধূলো থেকে, কোন নিরন্ন কৃষকের কুঁড়ে ঘর থেকে, কোন ঘর্মাক্ত শ্রমিকের বুপাড়ির থেকে খুঁজে বের করবে নিজেরা নিজেদের ত্রাণকর্তাকে। অথবা নিজেই উঠে বসবে ত্রাণকর্তার আসনে। গর্জে উঠে বলবে— সোহং। আমিই সেই।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস : শতবর্ষের আলোয়

সব্যসাচী গোস্বামী

লক্ষণীয় যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় বসার অনেক আগে থেকেই পশ্চিমবাংলায় গণসঙ্গীত চর্চা স্তিমিত হয়ে গেছে। আগে যেমন পাড়ায় পাড়ায় গণসঙ্গীতের দল ছিল; গণসঙ্গীতের দলগুলি বৃন্দগান প্রতিযোগিতা করত; মে দিবস; বলশেভিক বিপ্লব, ৮ই মার্চ উদ্‌যাপন হত পাড়ায় পাড়ায়, সেখানে ছোট ছোট গান-নাটকের দলগুলি নিজেদের উপস্থাপনা নিয়ে হাজির হত আজ সেগুলি আর দেখা যায় না। কেন এই বিচ্ছিন্নতা? এটা ঠিক, গণসঙ্গীত শিল্পের অন্তর্জালি যাত্রার পিছনে বিগত সরকারের অনেকটাই অবদান আছে। শুধু গণসঙ্গীত-গণসংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে রাজনীতির প্রতি-ই সাধারণ মানুষের মননে বিগত দল একটা ভুল বার্তা নিয়ে যাওয়ার কাজে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিন দশকের বেশি কাল ধরে এই কাজেই তারা সফল। কিন্তু শুধু এইটুকুকেই গণসঙ্গীতের সংকটের প্রধান কারণ হিসেবে দেখাটা বোধহয় একটু সরলীকরণ হয়ে যাবে। এটা ঠিক মেহনতী মানুষের সংগ্রামের সাথে তাল রেখেই বাংলার গণসঙ্গীতগুলি সৃষ্টি হয়েছিল, এবং একসময় তা কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু আজ কেন তা এত সংকটাপন্ন? দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী পদ্ধতিতে তার কারণ খোঁজা আজ একান্ত দরকার। তার আলোকেই আমরা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে পারব। তার আগে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কর্মময় ও কর্মময় জীবনী নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেওয়া যাক।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস জন্মেছিলেন ১৯১২ সালের ১৪ই জানুয়ারি, অধুনা বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার চুনারঘাট উপজেলার পশ্চিম মিরশি গ্রামে। তাঁর বাবা হর কুমার বিশ্বাস একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার হওয়া সত্ত্বেও নিজ শ্রেণির থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৯৩২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ জমানায় এবং ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস জমানায় তিনি জেলে যান। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ(আই.পি.টি.এ.) গড়ে তুলতে তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। ১৯৪২ সালে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের আমন্ত্রণে তিনি প্রথম কলকাতায় আসেন। যাঁদের দশকে ‘সোভিয়েত

দেশ' পত্রিকায় চাকরী করার সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। দু'বার তিনি সমাজতান্ত্রিক চীনে প্রতিনিধি হিসাবে যান। চীনা সূত্রে বেশ কিছু গানও তিনি লিখেছিলেন। কম্রোল, তীর, লাল লঠনের মত বেশ কিছু কালজয়ী নাটকের জন্য তিনি গান সৃষ্টি করেছেন। হেমঙ্গ বিশ্বাসের গান, শব্দগুলির গান নামে তাঁর দুটি গানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও লোকসঙ্গীতের শিক্ষা নামে তাঁর একটি গানের বই বাংলা ও অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। হেমঙ্গ বিশ্বাস দুটি ছবিতে প্রেব্যাক করেছেন— কোমল গাছার ও মেঘে ঢাকা তারা। সমস্ত জীবনজুড়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন শ্রমজীবী মানুষের জন্য গান। কণ্ঠ মিলিয়েছেন তাদের জীবন সংগ্রামে, শ্রেণী সংগ্রামে। কৃষক শহিদদের নিয়ে তাঁর সেই কালজয়ী গান, 'আমরা তো ভুলি নাই শহিদ... তোমার কইলজার খুনে রাঙাইল কে আন্ধার জেলখানা'। কিংবা ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে তাঁর সেই ব্যঙ্গাত্মক গান 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য', যা তদানিন্তন নেহরু সরকারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল। মার্কিন যুদ্ধবাজদের আনবিক বোমার সাহায্যে হিরোসিমা-নাগাসাকিতে বর্বরতম হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তীতে ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামের কাছে জন্ম হওয়া আজ ইতিহাস, তার সাথে বাংলা গানের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে হেমঙ্গ বিশ্বাসের শব্দচিত্র গানটিও। নৌ-বিল্লোহের সমর্থনে তাঁর প্রত্যয়ী কণ্ঠে আমরা শুনেছি 'বাজে যুদ্ধ দিশানী ঝড়ে রক্ত বিধান' গানটিতে। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত তেলেঙ্গানার সমর্থনে গান কিংবা সমাজতান্ত্রিক চীনের অভিজ্ঞতায় লেখা গান 'আমি যে দেখেছি সেই দেশ, উজ্জ্বল সূর্য রঙিন' গানগুলিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সন্দেহ নেই। লাল চীনের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর রচিত একটি গান দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে। গানটি হল, 'মোর গাঁয়ের সীমানায় পাহাড়ের ওপারে নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুন'। হেমঙ্গ বিশ্বাস লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল নাম আগেই বলেছি। বিশেষতঃ তাঁর ভাটিয়ালি গানগুলি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তাঁর কণ্ঠে 'সেলাম চাচা সেলাম তোমার পায়' কিংবা 'সোনা বন্ধুরে' অথবা 'মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা' শুনলে বোঝা যাবে তিনি কত উঁচু মাত্রার সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। দেশ ছেড়ে আসার যজ্ঞার কথা আমরা পাই তাঁর 'হবিগঞ্জের জালা কইতর' গানটিতেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আশাবাদী যার প্রতিফলন দেখা যায় 'বাঁচবো, বাঁচবো রে আমরা' গানটিতে।

যথেষ্ট উঁচু দরের শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও রঙিন হাতছানির প্রলোভনে তিনি কখনই পা দেননি। শেষদিন অবধি তিনি মেহনতি মানুষের পাশেই ছিলেন। মাস সিঙ্গার্স নামে

নিজের দল গঠন করে জীবনের শেষ দিকেও তিনি গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেরিয়েছেন। গণসঙ্গীতের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই দেখব, প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের হাত ধরেই দেশাত্মবোধক গানগুলি রচিত হচ্ছিল। মুকুন্দ দাস কিংবা কাজী নজরুলের মত শিল্পীরা যেমন দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন পাশাপাশি তাদের গানে ধীরে ধীরে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের কথাও প্রতিফলিত হচ্ছিল।

তথাপি বলা যায় বামপন্থীদের হাত ধরেই বাংলা গানে ব্যাপকভাবে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম স্থান পেল যেগুলো জনপ্রিয় হল 'গণসঙ্গীত' নামে। গণসঙ্গীতের সূচনা লগ্নেই আমরা পেলাম বটুকেশ্বর দত্ত, নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পাল, সলিল চৌধুরী এবং হেমঙ্গ বিশ্বাসদের মত উঁচুদরের গায়কদের।

পরবর্তীতে পেলাম আরো অনেক। নৌবিল্লোহের সমর্থনে গান রচিত হ'ল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কায়ুর ভাইদের নিয়ে গান রচিত হ'ল। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে গান রচিত হ'ল। তেলেঙ্গানার সমর্থনে গান রচিত হ'ল। তেভাগা আন্দোলনের সংহতিতে গান রচিত হ'ল। বন্দিমুক্তির দাবীতে গান রচিত হ'ল। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে গান রচিত হ'ল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গান রচিত হ'ল। সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাদ নীতির বিরুদ্ধে গান রচিত হ'ল। যৌথখামারের স্বপ্ন নিয়ে গান রচিত হ'ল। গণসঙ্গীতের এই

বিস্তৃত ইতিহাসে হেমঙ্গ বিশ্বাস একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। গণআন্দোলনে আরোপিত কিছু সীমাবদ্ধতা শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলনেও স্বাভাবিকভাবেই কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল সন্দেহ নেই। ফলতঃ ব্যাপক মেহনতি মানুষের জন্য রচিত গান, ব্যাপক মানুষের গানে পরিণত হতে পারল না। গান গণআন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল ঠিকই কিন্তু তা গণআন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হল। বিশেষতঃ বারতীয় সমাজ সম্পর্কে বামপন্থীদের বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা যা স্বাভাবিকভাবে সংগ্রামের সঠিক রণনীতি-রণকৌশল নির্ধারণে ব্যর্থ হল এবং দিশাহীনতার জন্ম দিল এবং অন্তিম পরিণতি হিসাবে অধঃপতিত হল আর গণসঙ্গীত পরিণত হল ভোটের প্রচার সঙ্গীতে। আন্দোলনের

• দলিত ও নিম্নবর্ণীয় •
• প্রান্ত বাসীরা ত থাকখিত •
• ব্রাহ্মণ্যবাদী 'বাবু' সংস্কৃতির •
• আঙিনায় ব্রাত্য থেকে গেল •
• চিরকাল। ফলতঃ শ্রেণিচ্যুত •
• উচ্চবর্ণীয় পরিবার থেকে •
• আসা সাংস্কৃতিক কর্মীও •
• ত থাকখিত নিম্নবর্ণের •
• মানুষের হৃদয় পেল না। •

এই সামগ্রিক সীমাবদ্ধতা থেকে কোন ব্যক্তিই মুক্ত হতে পারেন না। হেমাঙ্গ বিশ্বাসও নিঃসন্দেহে পারেন নি। পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔরসজাত ও ভারতীয় সামন্তবাদের গর্ভজাত এলিট উচ্চবর্ণীয় সমাজের নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত 'নবজাগরণ' বহুদিন আগেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সাথে গ্রামের কৃষক সমাজের একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরী করেছিল। দলিত ও নিম্নবর্ণীয় প্রান্তবাসীরা তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী 'বাবু' সংস্কৃতির আড়িনায় ব্রাত্য থেকে গেল চিরকাল। ফলতঃ শ্রেণিচ্যুত উচ্চবর্ণীয় পরিবার থেকে আসা সাংস্কৃতিক কর্মীও তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের হৃদয় পেল না। বিপরীতটাও সত্য। বামপন্থীরা সঠিকভাবে ভারতের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয়গত সংগ্রামগুলোর ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন অবধি সঠিক লাইনই হাজির করতে পারেনি। তাদের এই যাবতীয় চিন্তা জগতের সীমাবদ্ধতা দৈন্যতা গণসঙ্গীত তথা গণসাংস্কৃতিক আন্দোলনেও প্রতিফলিত হয়েছিল। ৬-এর দশকের শেষভাগ অবধি এই নবজাগরণের শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে বামপন্থীরা ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি জাতিসত্তার সমস্যা, আত্মপরিচয়ের সমস্যা, সংখ্যালঘুর সমস্যাদুলোকে দ্বন্দ্বিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা থেকে গেছে। এর অনিবার্য প্রতিফলন পড়েছিল গণসঙ্গীতেও। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই গণসঙ্গীত কৃষক সমাজকে ততটা আলোড়িত করতে পারেনি। টুসু-ঝুমরি-কবিয়াল-ভাটিয়াল-জারি-সারি-বারোমাস্যা-গাঙ্গীর গান-ভাওয়াইয়া-বাউল-কীর্তনের আদিকগুলোকে গণসঙ্গীতকারেরা খুব একটা ব্যবহার করেন নি। ফলতঃ বাংলার গণসঙ্গীত মধ্যবিত্তদের বৌদ্ধিক চর্চায় যতটা স্থান পেয়েছে কৃষকের জীবনচর্চায় ততটা স্থান পেল না।

সত্তরের দশকে অন্তত তাত্ত্বিকভাবে এই প্রশ্নগুলোকে সামনে আনা হ'ল। পাশাপাশি এই দশকের সংগ্রামীদের সামনে ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্পষ্ট দিশা। তাই সত্তরের গণসঙ্গীতগুলো মানুষকে উজ্জীবিত করেছে অনেক বেশি। তথাপি বিচ্ছিন্নতা কাটানো যায় নি।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে লোক-আঙ্গিককে ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সলিল চৌধুরীর সাথে তাঁর বিতর্কও আজ আর অজানা নয়। সলিল চৌধুরী পাশ্চাত্যের সুরের সাথে দেশীয় লোক-সঙ্গীতের সুরের সমাহার ঘটাতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রথম দিকে ছিলেন তার ঘোর বিরোধী। পরবর্তী জীবনে তিনি অবশ্য তাঁর এই অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রসঙ্গে আশিষ মুখার্জী

৫৩শ মুসলমান মিলন হওয়া কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব। কি করে সম্ভব, কেন বিরোধিতা এবং ঝান কাল ভেসে তার বিভিন্ন মাত্রা, এসব খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে ধরে ধরে আলোচনার বিষয়। তার চেষ্টা খানিকটা করা যেতে পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ শুরু করব কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের একটা ঘটনা দিয়ে।

ঘটনাটি আমি জানতে পারি অতি সম্প্রতি তার বাসস্থান দেউলটির কাছে পানিব্রাসে। ৭৬৫০ গিয়ে। ঘটনাটি যিনি বলেছেন তিনি পেশায় স্কুল শিক্ষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭৫০ এম.এ. এবং বাস ওই অঞ্চলেই।

শরৎচন্দ্র ঐখানে বাসকালে তার গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী মুসলমান-প্রধান গ্রামের মধ্যে একটি মতান্তর, বচসা বা কগড়া হয়। ঐ গ্রামের গরু এ গ্রামের ফসল নষ্ট করে - এইটুকু ছিল তার অজুহাত। তার নিজের গ্রাম ব্রাহ্মণ প্রধান; তারা পাশের গ্রামের মুসলমানদের গরুগুলোকে তাদের গ্রামের সমিহিত চারণভূমিতে চরতে বাধা দেবেন এই মনস্থির করেন। ৭৬৫০ এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। শরৎচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। তার একটা পরিচিতি ছিল। সেই সুযোগ গ্রহণ করে তিনি মধ্যস্থতা করেন এবং ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়ে দেন। গ্রামটিতে শরৎচন্দ্রের সম্মানার্থে একটি মূর্তি স্থাপন করা হয় এই কথা স্মরণে রাখার জন্য।

এর পরেই শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পটি লেখেন। যে মাস্টারমশাই আমাকে গল্পটি বলেন তার ভাষায় — 'এটি একটি symbolic গল্প। মহেশ হল হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সীলক। নয়ত মুসলমানের ঘরের গরুর নাম মহেশ হয় কি করে?'

এই উপলক্ষে একটা ধন্যবাদ দিতে হয় 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ' বিভাগকে যারা শরৎচন্দ্রের বাড়িটি নতুন করে গড়ে দিয়েছেন। তারা মহেশ গল্পের সেই অবিস্মরণীয় লাগন কয়টি, অর্থাৎ — 'আম্মা আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেঁস্তা নিয়ে মেরেছে। তার চরে খাওয়ার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের মাস, তোমার দেওয়া তেঁস্তার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ নেওনা' বাড়িতে চোকর মুখেই একটি মার্কেল প্লেটে খোদাই করে স্থাপন করে দিয়েছেন।

৫৩শ মুসলমান সম্পর্কের মাইল ফলাকে প্রথমে আমরা তিনটি সালকে সামনে রেখে আলোচনা শুরু করব। সেগুলি হল ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সালের ১৫ই

আগস্ট ও ১৮৫৭ সাল।

প্রথমে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কথা ধরা যাক। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ ঘটনার গুরুত্ব কি? এই বিদ্রোহে সিপাহীরা এবং রাজন্যবর্গ ধর্মকে গ্রাহ্য না করে একত্রে লড়েছিল তাদের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ধর্মের বিভেদ তাদের বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

এবার আসা যাক ১৯৪৭ সালের কথা। এই সালটির বা গুরুত্ব কি? এর গুরুত্ব হল একই সঙ্গে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করে গেল, নাম কা ওয়াণ্ডে ক্ষমতা হস্তান্তর হল, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে তারা দেশটাকে দু-টুকরো করে দিয়ে গেল। ১৮৫৭ সাল থেকে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল তা তো নস্যাৎ হয়ে গেলই উপরন্তু দেশটা সামাজিকভাবে বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। পরস্পরবিরোধী দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। কি করে এমন হল? কে করল?

বলাবাহুল্য এ পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের তৈরি। নীতিগতভাবে লর্ড কার্জন স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন যে সাম্রাজ্যকে বিভেদ করে শাসন করা রোমানদের নীতি এবং আমরা সেই নীতি অনুসরণ করব। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগ বস্তুত ব্রিটিশদের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের অসফল স্বপ্নের রূপায়ন, এটা বোঝা খুব কষ্টকর নয়। তবে মনে রাখতে হবে এই বি-জাতি ভেদের মতাদর্শগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আর একজনের দ্বারা আরও আগে। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ রাজপুরুষ W. W. Hunter তার 'The Indian Musalman' বইটির মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করেন। মনে রাখতে হবে ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের দশ বছর আগেই এই বইটি রচনা করা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী শক্তি ও ঔপনিবেশিক শক্তির মধ্যে লড়াইয়ে প্রথম চালটা দিয়েছিল শাসক শক্তিই। তা সত্ত্বেও এটা লক্ষ্য করার যে, আমাদের জাতীয়তাবাদী সংগঠনের নামটি ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু জাতীয় কংগ্রেস নয়। হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। কেননা ঠিক তার আগের তিনটি দশকে জাতীয়তাবাদ কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছিল ঐ রকম একপেশে নামে। উদাহরণ — নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা', রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' যে সবগুলিই ছিল জাতীয় সচেতনতার প্রকাশ। জাতীয়তা ও হিন্দুত্ব এই পর্যায়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

তা কিন্তু এমনি এমনি হয়নি। এর পিছনে শাসক হিসেবে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের এবং ১৯৫৯ থেকে মহারাজা ডিক্টোরিয়ার আমলে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের সচেতন প্রয়াসের ফলে। ভারতে হিন্দু পুনরুত্থানের পিছনে একটা বড় ভূমিকা আছে প্রাচীন গ্রন্থাবলির পুনরুজ্জীবনের। এ বিষয়ে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হলেন জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার, যাকে বিবেকানন্দ দ্বিতীয় সায়নাচার্য বলে ডাকতেন। এই ম্যাক্সমুলার ছিলেন ভাষাবিদ, তিনি

১৯৫৯ সালে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রসঙ্গে কাজ করেন। কিন্তু এই কাজে তাকে সহায়তা করেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান কোম্পানি মহিমে করা স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করে। কেন? তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?

ম্যাক্সমুলার যে কাজটা করলেন তা বিশ্লেষণ করলেই সেই উদ্দেশ্য ধরা পড়বে। তিনি লক্ষ্য করলেন যে আর্থার ছিল একটি জাতি এবং ভারতীয় আর্থার ও ইউরোপীয় সিস্টেমের আদর্শ একই গোষ্ঠীভুক্ত আর হিন্দু ধর্ম আর্থার ধর্ম বই আর কিছুই নয়। অর্থাৎ শালক ও শাসিতের মধ্যে একটা জাতিগত ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা। তথাকথিত হিন্দুদের দলে টানার চেষ্টা। বহাবাহুল্য সে Theory সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

এই সময়ের কথা আর একটু বলি। এই পর্যায়ে ১৮৫৯ সালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সালে শব্দ যে কোম্পানির হাত থেকে মহারাজার হাতে ভারতশাসনভার চলে গেল তাহি নয়, বরং সালেই প্রকাশিত হল মার্ক্সের ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের অংশবিশেষ (A contribution to the criticism of political economy) এবং ভারতীয়দের আর্থার ও স্পিসিস। যেখানে মার্ক্সের কপালে জুটল a conspiracy of silence, সেখানে ভারতীয়দের বইটি বুর্জোয়াদের পাগল করে দিল। কেননা উক্ত বইটি ব্রিটিশরাণিটির পায়ের তলা থেকে শেষ জমিটুকু কেড়ে নিল, মুখ খুবড়ে পড়ল খ্রিস্টীয় আর্থার ও স্পিসিসের তত্ত্ব। তারপরই ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে শুরু হল ভূত, অদ্বৈত, ভগবান, কৃষ্ণের উন্মাদ নৃত্য।

১৮৮৮ সালে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্ক্স লিখেছিলেন, দুটি শ্রেণী মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণী। আবার ১৮৪৮ ছিল ইউরোপে শ্রমিক বিপ্লবের বছর যা সে সময় সফল হতে পারেনি। কিন্তু জায়মান শ্রমিক শক্তি তখন তা আঘাতের দশাতেই ছিল। তা আছড়ে পড়ল ১৮৭১-এ প্যারিস কম্যুনে — আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম সরকার। কিন্তু ওই দশকের পর ১৯০৫-এর রাশিয়ার বিপ্লবের মাধ্যমে অবশিষ্ট লেনিনের মতে ইউরোপে শ্রমিক বিপ্লবের উত্তর দশা। 'বুর্জোয়া বিকাশের মাধ্যমে শান্তির কাল'। কি কি কারণে এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণী তার বিক্রম হারিয়ে ফেলল তা খুঁটিয়ে দেখার বিষয়। তবে আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় শ্রমিক শ্রেণীর চেতনাকে ধর্মীয় বা obscurantist (জ্ঞান ও সংস্কারের প্রসারে বাধাদানকারী) নীতি) চিত্রিত করে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিল বুর্জোয়া-ফিল্ডভাল লর্ড জেটি। হ্যাঁ এই কালেই বুর্জোয়ারা তাদের ইতিহাস নির্দিষ্ট প্রাচীনকে ধ্বংসের ভূমিকা থেকে খুব সচেতনভাবে পালক পুরনো শ্রেণীর সাথে সমঝোতা করল যার মূলগত ক্লাসিকাল উদাহরণ হল আমানি; এবং সাজান ঠাটবাটের দিক থেকে উদাহরণ হল ইংল্যান্ডে রানীর পোস্টটি দাখল ও তাকে পালমেন্ট ও চার্চের nominal (দেখানো) প্রধান করে রাখা। বুর্জোয়াদের কৌশলের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল এঙ্গেলস তার বর্ণনা দিয়েছেন এই

বলে যে, 'এখন ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণী শীত ঘূমে চলে গেছে . . . তার এখন কার্ডিনাল ম্যানিংয়ের গাউন ধরে হাঁটছে'।

এই কৌশল থেকে ইংল্যান্ডের শাসক শ্রেণী যে লাভ পেল তা কাজে লাগল ভারতের নবজায়মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে। মানুষের মনের জমি তারা ভিজিয়ে জাবজাব করে লাগল যা কিছু নোংরা, পশ্চাৎপদ, প্রতিক্রিয়াশীল তাই দিয়ে। এ না হলে ঘটনা অন্যরকম হত। জোয়ারের সময় সব বাধ ভেঙে যায়, তা না হয়ে নব উত্থিত জাতীয়তাবাদী জোয়ারের কালে অত বেড়া নতুন করে সৃষ্টি হল কেন?

জাতীয় আন্দোলনের নেতারা ধর্মীয় পুনরুত্থানের আবহাওয়ায় কি করলেন? তিলক গণপতির পূজা চালু করলেন, বিপিনচন্দ্র পাল কালী পূজার আয়োজন করলেন, সশস্ত্র বিপ্লবীরা গীতা আওড়াতে লাগলেন — সবাই বেমাণুমে ভুলে গেলেন দেশের অর্ধেক লোক অন্য ধর্মের।

এই কথাটা কিন্তু অন্য একজন ভেবেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গের গুরুত্বই হিন্দু-মুসলমান রাষ্ট্রী বন্ধনে যে ঐক্যের সূচনা তা রবীন্দ্রনাথেরই এবং তিনি যাঁর ভাবশিষ্য তিনি রামমোহন রায়। তার ব্রাহ্ম ধর্মের এক ঈশ্বর ভাবনা ও উপাসনা পদ্ধতির কথা ভেবে দেখুন। সেই ভাবনায় সব ধর্মের লোকেরা কি এক হতে পারত না? আশ্চর্যের বিষয় - যে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' লিখেছিলেন তিনি নিজে ছিলেন ব্রাহ্ম। ওই সময় থেকেই হিন্দু পুনরুত্থানের চাপে ব্রাহ্ম ধর্ম তার initiative হারিয়ে ফেলল। স্মরণ্য যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হাত ধরে অল্পেত বেদান্ত ও কালী পূজা রমরমা বাজার পেল, সেই দুই ব্যক্তিকেই কিন্তু ইউরোপে সামনে এনেছিল শাসকরা। রামকৃষ্ণকে পরিচিত করান ম্যাগসমুলার আর বিবেকানন্দ যে ধর্ম সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড ফেয়ার-এর একটি শাখা। সেইরকম মেলা প্রথম হয় ১৮৫১ তে প্যারিসে, যার স্মরণ্য হিসেবে তৈরি করা হয় আইফেল টাওয়ার। লেনিন বলেছিলেন 'railway is the summation of bourgeois industry' অর্থাৎ steel industry এবং আইফেল টাওয়ার সেই স্টীলেরই বিজয়পতাকা। সুতরাং সেই পর্যায়ে প্যারিসের ক্যাপিটালিস্টরা তাদের তাকত দেখাতেই মগ্ন ছিল। কিন্তু ১৮৯৩ তে অবস্থাটা পাশ্টে গেল। তখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল এশিয়ার প্রাচীন ধর্মগুলোর অনুসন্ধান, অনুশীলনে। উদ্দেশ্য জায়গা-হারানো খ্রিস্টীয়ানিটির পক্ষে অন্য কোন ধর্মকে বসানো যায়? নইলে একটা বদ্ধ ঘরে কতিপয় ধনকুবের ও কুমারী বৃদ্ধা, যারা সেইসময় আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অত্যাচারের মধ্যে তাদের মনের সাধনা খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং কিছু ধর্মের গোঁড়া লোকজন তাদের সামনে করা বক্তৃতা আমেরিকায় অত পাবলিসিটি পেল কি করে? আজকের দিনের মিডিয়া ক্যারন ও মিডিয়ার ভূমিকা এবং বিশ্বসুন্দরী সৃষ্টি করে একটা দেশের মার্কেট ধরার কথা মনে করলে বুঝতে পারবেন এই সবের মূল ওই

লগ্নায়েই ছিল। কারণ আমেরিকাও তখন লগ্নি-পুজির যুগে প্রবেশ করে গেছে, হে মার্কেট ক্রীড়া! কারণ তারা ততদিনে হাত পাকিয়ে ফেলেছে।

এ কথাটা পলাত য়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা সবকিছুই নেড়েচেড়ে দেখেছে। এর একটা প্রমাণ দাঁড়ি। ১৯১৯ সালে 'উপনিবেশ তত্ত্বে' লেনিন উপনিবেশের শ্রমিক শ্রেণীর জন্য যে যে কথাটা নির্দেশ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম pan-islamism -এর বিরোধিতা যা তার মধ্যে ১৫টিশেরই তৈরি। সকলেই জানেন এই পশ্চাৎপদ pan-islamism -এর পাঠ্যগোষ্ঠী তুর্কের আধুনিক কামাল আতাতুর্কের মোকাবিলা তারা করেছিল অতি প্রাচীন খলিফা পদটিকে সামনে alternative হিসেবে এনে। আর ঠিক এই জিনিসটি ভারতে তাদের planned agent মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী করলেন অসহযোগ ও মিলাফতের মিশ্রণ খটিয়ে। ভারতীয় মুসলিমদের মুখটাও ঘুরিয়ে দেওয়া হল পিছন দিকে।

এই কথাগুলো বলার কারণ ধর্মীয় পুনরুত্থান-এর পিছনে একটি আর্থ-রাজনীতি এবং শাসকশ্রেণীর নীতি ছিল এইটা দেখানো যা ১৯৪৭-এর পরেও অব্যাহত আছে এবং বর্তমান পৃথিবীর শাসক আমেরিকান লগ্নি পুজি তার পরিচালক। উদ্দেশ্য সেই একটা ভাগ করে শাসন করা। তার কারণ এবার আমরা যখন ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বর গান্ধী মসজিদ ভাঙ্গার পর্যালোচনা করব তখন এই প্রেক্ষাপট আমাদের কাজে লাগবে।

গান্ধী মসজিদের সময়ে যাওয়ার আগে আরও একটা বিশেষ দিন ধরে আলোচনা করা যাক। সেটি হল ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট যেদিন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এই দিনটি বিশ্লেষণ করতে গেলে কিন্তু মনে রাখা দরকার আরও একটি দিনকে সেটি হল ১১ই ফেব্রুয়ারি। ১১ই ফেব্রুয়ারি ছিল আব্দুল রশিদ আলি দিবস। অর্থাৎ সূভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ভারতকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করতে গিয়েছিল তার ই এক ক্যাপ্টেন আব্দুল রশিদকে ব্রিটিশ সরকার সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই সশ্রম কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতায় ছাত্রদের ডাকা বন্ধের দিন হল ১১ই ফেব্রুয়ারি। সারা কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট দিয়ে দিনটি শুরু হয়, শেষ হয় ৮৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু ও অসংখ্য আহতদের দিয়ে। দক্ষিণ কলকাতায় মিলিটারিদের ৩৩টি ট্রাক খালি হয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেটা আমাদের মনে রাখা দরকার ওই সময়ে হিন্দু-মুসলিম একত্রে ইউরোপীয় শাসকদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

তাহলে মাত্র ৬ মাস বাদে ভাতুঘাতি দাঙ্গা হয় কি করে? অর্থাৎ দুটি পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর লড়াই চলছিল — জাতীয়তাবাদী ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী। এবং এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ বিরোধী বলের কাছে, তাদের কৌশলের কাছে এবং সেই বলের সাহায্যকারী পাটিগুণ, ব্রিটিশরাজ, ভারতীয় বুর্জোয়া (হিন্দু, মুসলিম, পার্শি নির্বিশেষে) এবং ভারতীয় গান্ধীবাদ এবং জমিদার এদের কর্মকাণ্ডের জালে জাতীয়তাবাদী শক্তি পরাস্ত হয়। সেই

ইতিহাস প্রত্যেককেই খুঁটিয়ে দেখতে হবে। জানতে হবে প্রত্যেকটি শ্রেণী ও তাদের representative পার্টিগুলোর ভূমিকা। আরেকদিকে, জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর প্রবল উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও তাদের কৌশল, নীতির ব্যর্থতা, খামতির দিকগুলো। কেননা প্রধানত সেই দুই শক্তির লড়াই এখনও চলছে। এসেছে তাদের নতুন রূপ। এইটুকু শিক্ষা ইতিহাস থেকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আসব ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বরের ঘটনায়।

৬ই ডিসেম্বরের তাৎপর্য কি? ৬ই ডিসেম্বরের তাৎপর্য এই যে ঐ তাণ্ডবলীলা চলাকীন এবং মনে রাখতে হবে একই সময়ে ঘনিয়ে ওঠা মণ্ডল কমিশন হট্টগোলের মাঝে নিঃশব্দে নীরবে প্রায় সকলের চোখের আড়ালে কোন প্রতিবাদের অবকাশ না দিয়ে নরসিমা রাও সরকার, অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করে ফেলেছেন নয়া অর্থনৈতিক চুক্তি। ঐ চুক্তি সম্পাদনের পর এই কুড়ি বছর ধরে ভারতীয় শ্রমিক, কৃষক ও জনগণ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন যে ঐ চুক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এক নবতর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না। কোন নেপায় দই মেরে গেল? উত্তর হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাহলে ঐ সমাজ বিদীর্ণকারী জোড়া গণ্ডগোল সৃষ্টি কার? নিশ্চয়ই তাদের প্ল্যান ওগুলি।

প্রশ্ন হল ঐ ঘটনার দিন থেকে কি ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি? ১৯৫০, ১৯৬০, ১৯৭০-এর তুলনায় কি এখন এই সম্পর্ক অনেক বেশি বিঘ্নপূর্ণ হয়ে ওঠেনি? অবশ্যই তাই হয়েছে। কেনন করে ঐ ঘটনা ঘটেছিল? একটু মোটা দাগে মনে করলেই দেখা যাবে টিভিতে রামায়ণ প্রচার থেকে আরম্ভ করে করসেবা, ইট নিয়ে যাওয়া, আদবানির রথযাত্রা সবই ঐ দিনটির পূর্বসূরি। রথযাত্রার পর তো সেই পরিক্রমা পথের দাগ ধরে একের পর এক দাঙ্গা হয়েছে। তাহলে কি দাঁড়াল? দাঁড়াল এই যে গণতন্ত্রের বুকুর উপর বসে এবং তারই আড়ালে আজকে সাম্রাজ্যবাদী ও দেশি শাসক জোটগুলো ইচ্ছেমত একটা ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেখানে টিভি থেকে খবরের কাগজ, ইতিহাস বিকৃতকারী থেকে রাজনৈতিক দল বা ভোটের আঙ্গিনা থেকে সাধুসেবা সবকিছুকেই তারা ব্যবহার করতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় কথাটা এই যে, এতসব করার পরেও পরস্যা দিয়ে একেবারে সরাসরি গুলো লেলিয়ে তবে তাদের দাঙ্গা বাঁধতে হয়। এবং দাঙ্গার সেই ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেই সব জায়গায় সাধারণ মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করে বিধর্মী আক্রান্তকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। এই অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান মিলন কি করে সম্ভব? বিশেষত যখন বাবরির ধারাবাহিকতায় গোধরা এসে গেছে। সেগুলো সম্বল করা খুব কঠিন নয়। সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক-ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে সেই সূত্র বেরিয়ে আসবে। তবে একটা কথা নিশ্চিত - সব প্রশাসের মূলে রাখতে হবে বিভেদকারী শক্তির বিরুদ্ধে মিলনের শক্তিকে গড়ে তোলা, জয়ী করা। বিভেদের শক্তির একটা প্রাণকেন্দ্র আছে, মিলনের শক্তিরও তা চাই।

কারা লড়েছিল, কারা লড়ছে

অর্ক সেনগুপ্ত

আন্দোলন-পেরিয়ার-ফুলে-বেগম রোকেয়া-র চিন্তাভাবনা দলিত মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তবু আমার বোঝাপড়ায় মার্কসীয় দর্শন দলিত মুক্তির পথে সঠিক দিশা। আবার আরেক ঘটনা হল বিপ্লবী মার্কসবাদীরা যে শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামের ইতিহাস বারবারই তুলে ধরেন সেইগুলিতেই সংখ্যার দিক দিয়ে তো বটেই, নেতৃত্বের দিক দিয়েও সামনের সারিতে থেকেছেন ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের শিকার দলিত, আদিবাসী ও তাদের সবচেয়ে কাছের সাথী সংখ্যালঘুরা। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাটির দিকে বোধহয় আমার মার্কসবাদী বন্ধুরা খুব বেশি নজর দেন নি। একই সাথে এটাও সত্য যে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক, অপোষহীন লড়াইতে যুক্ত আন্দোলনপন্থী, পেরিয়ার বাদী, ফুলে বা বেগম রোকেয়ার অনুগামীরাও বারবার শ্রেণী সংগ্রামের ময়দানে শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণীতেই কেন দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। আমরা যদি কমবেশি ১৫০ বছরের কিছু সমাজে আলোড়ন ফেলা কয়েকটি সংগ্রামের দিকে তাকাই তা হলেই এ সত্য সামনে উঠে আসবে যে, মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণী সংগ্রামে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে দলিত-সংখ্যালঘু।

আমরা শুরু করি ১৫০ বছরের কিছু আগে সংগঠিত ছিল বিদ্রোহ দিয়ে। বৃটিশরাজকে কাঁপিয়ে দেওয়া এই বিদ্রোহ ছিল আদিবাসীদের নেতৃত্বে ও অংশগ্রহণে। মূলত এই বিদ্রোহ আদিবাসীরা করলেও গরিব দলিত ও সংখ্যালঘুরা এই আন্দোলনকে শুধু সমর্থনই করেননি বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণও করেন। বৃটিশরাজ তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের আর একটি দিক ছিল। সেটি হল 'দিকু' জমিদার-মহাজনদের বিরোধীতা। 'দিকু' মানে বাবুরা প্রত্যেকেই ছিল উচ্চ বর্ণের ধনী হিন্দু, ফলে এখানে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণ এখানে শ্রেণীশোষণকে রক্ষা করছিল বৃটিশদের লুণ্ঠনের সাথে, বলা ভাল সহযোগী হয়ে। তাই এই শ্রেণী সংগ্রাম ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরও একটি উদাহরণ, যাতে আদিবাসীদের নেতৃত্বে গরিব, দলিত ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে এক যৌথ মোর্চা স্থাপিত হয়েছিল। মার্কসবাদীদের ভাষায়

যেটিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী মোর্চা বলা যেতে পারে, যা কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী মোর্চাও ছিল। উচ্চবর্ণের ধনী হিন্দুরা খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনকে শুধু বিরোধীতাই করে তা নয়, বরং এই আন্দোলনকে দমন করতেও ব্রিটিশদের সহায়তা করে। কারণ তাদের বর্ণগত আধিপত্য ও শ্রেণীস্বার্থ, দুটিতেই এই আন্দোলন আঘাত হানে।

বাংলা নাটকের এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি 'নীলদর্পন' লেখা হয়েছিল আরেক কৃষক সংগ্রাম 'নীল বিদ্রোহ' কে কেন্দ্র করে। নীলকরদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের এই লড়াইয়েও নেতৃত্বও প্রধান শক্তি সেই গরিব দলিত সংখ্যালঘুরা। একই কুনাটোর পুনরাবিনয়ে ব্রিটিশ ধনী উচ্চবর্ণদের থেকে, আন্দোলন বিরোধীতা ও তাকে ধ্বংস করতে উঠে-পড়ে লাগা, কারণ সেই এক, আঘাত লাগছিল ব্রিটিশদের শ্রেণী স্বার্থ ও ধনী উচ্চবর্ণের বর্ণগত অধিনতা ও শ্রেণী স্বার্থের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছিল এই আন্দোলন। ফলে আবার সৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বিরোধী মোর্চা, যা আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী জোটও। একটা কথা, লেখার বিষয়বস্তুর সাথে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করতে চাই, এই সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি নিয়ে 'নীলদর্পন' লেখেন উচ্চবর্ণের দীনবন্ধু মিত্র, ফলে উচ্চবর্ণ মাত্রই দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুর শত্রু, তা বোধহয় নয়। যদিও এটা আরও বড় সত্য যে এমন মানুষ ব্যতিক্রমী, সংখ্যায় খুবই কম।

বাঁশের কেদা, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে এক অসম সাহসী লড়াই। নেতৃত্বে এক ধর্মাস্ত্রিত সংখ্যালঘু তিতুমির (যদিও এদেশের প্রায় সব সংখ্যালঘুই ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণের ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মাস্ত্রিত)। আন্দোলনকারী-সমর্থক ও বিরোধীদের ক্ষেত্রে সেই আগের দুটি ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। তবু এই আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেন, তাদের একজনের কথা বলতেই হয়, বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি এই আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছিলেন— 'তিতুমিরকে সমর্থন করিয়া ব্রিটিশদের বিরাগভাজন কদাপি হইব না'। যতই এটা মানতে খারাপ লাগুক, কিন্তু এটাই সত্য যে বাংলার তথাকথিত রেনেসাঁস এইভাবেই ব্রিটিশ তোষণ করে গেছে।

মার্কসবাদীরা বলবেন এ হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের জোট, কিন্তু এটাও লক্ষ্যীয় যে এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের অস্তিত্বও উজ্জ্বল। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সামন্তশ্রেণী মূলত উচ্চবর্ণ হিন্দু। একথা মানতেই হবে যে ব্রাহ্মণ্যবাদের একটা শ্রেণীগত শোষণের দিক অবশ্যই ছিল, আছে। সাথে এটাও মানতে হবে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ শ্রেণী শোষণের ক্ষেত্রে এক আলাদা উপাদান যা এই দেশ বাদে আর কোথাও সেভাবে দেখা যায় না। এখানেই বারবার শ্রেণী সংগ্রাম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এক হয়ে গেছে আন্দোলনের ময়দানে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নেতৃত্বে নিঃসমভাবে দমন করা হল বিদ্রোহ আবার জলে ওঠে উলুপুলানের মাধ্যমে। আদিবাসীদের নেতৃত্বে গরিব-দলিত-সংখ্যালঘুর সমর্থন ও সক্রিয়তায় গড়ে ওঠে এই আন্দোলন, এবার সরাসরি ব্রিটিশ সরকারে বিরুদ্ধেই। আবারও লক্ষ্যীয় বিষয় হল আন্দোলনকারী আদিবাসী-দলিত-সংখ্যালঘু এবং আন্দোলন প্রকৃতিগতভাবেই শ্রেণী সংগ্রাম। এখনও পর্যন্ত উল্লেখ করা আন্দোলনগুলিকে বাদ দিয়ে এই দেশের ইতিহাস রচনা করার কথা কেউই ভাবতে পারেন না। আন্দোলনকারী কারা ও আন্দোলনগুলির চরিত্রই বোধহয় শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতি-বর্ণবিরোধী সংগ্রামের আন্তঃসম্পর্কের দিকে আলো ফেলছে।

এবার আমরা তাকাবো এমন কিছু আন্দোলনের দিকে, যেগুলিকে মূলত মার্কসবাদীরাই ঐতিহাসিক বলে দাবী করেন এবং দেখব সেগুলিতেও কারা আন্দোলনের মূল শক্তি। বর্তমান বাংলাদেশ, তথা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের পাবনা কৃষক বিদ্রোহের কথা যদিও ইতিহাস বইতেও খুব একটা ঠাঁই পায় নি, তবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ছিল মূলত জমিদারদের শাসনকে অস্বীকার করার এক লড়াই। আর এ দেশে জমিদাররা যে উচ্চবর্ণের তা মোটামুটি সবাই জানি। এক্ষেত্রেও বিদ্রোহী কৃষকরা ছিলেন দলিত ও সংখ্যালঘুই মূলত।

আসুন, এবারে তাকাই ভারতের পশ্চিম প্রান্তে। ভারতের বুকে হওয়া প্রথম বড় মাপের শ্রমিক ধর্মঘট, মুম্বাইয়ের (তৎকালীন বোম্বাই) গিনি কমগড় ইউনিয়নের ধর্মঘটের দিকে। এই ধর্মঘট যখন প্রথমবার ডাকা হয়, তখন আন্দোলনকারীরা এতে যোগ দেন নি এবং এই ধর্মঘট প্রত্যাশিত সাফল্যও পায়নি। দ্বিতীয়বার ধর্মঘটে আন্দোলনকারীরা যোগদান করেন এবং এই ধর্মঘট প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দি বুজেরাদের বুক কাঁপিয়ে ইতিহাস রচনা করে। প্রথমবারের ধর্মঘটে আন্দোলনকারীদের যোগদান না করার পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির কোন ভুল ব্যবহার কাজ করেছিল নাকি আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে দলিতদের একটা বড় অংশ প্রথম ধর্মঘটে সামিল না হওয়ার জন্যই সেটি প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। দ্বিতীয়টিতে তারা সামিল হওয়াতেই আন্দোলনটি ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে। ফলে এটাও পরিষ্কার যে ঐ সময় শ্রমিক শ্রেণীর সংহতাগত ছিল দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরা এবং আজও তাই। ঐ ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনেও প্রাণ বায়ুর ভূমিকা নেয় শ্রেণীগতভাবে সংগঠিত দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরাই।

তেভাগা-ভারতের কৃষক সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় নাম। উৎপন্ন ফসলের ৩ ভাগ পাবে কৃষক, ১ ভাগ পাবে জমিদার এই দাবিতে গড়ে ওঠে এই আন্দোলন। দাবির মধ্যে কোথাও জাতি-বর্ণগত শোষণের বিরোধিতা নেই। কিন্তু লড়ল সেই দলিত-আদিবাসী-

সংখ্যালঘুরাই। বালুরঘাট থেকে কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা থেকে ভাঙড় জমিদারতন্ত্রের ওপর মরণপণ আঘাত হানল তারাই। লক্ষণীয় বিষয় হল, যখন উত্তর দিনাজপুর তেভাগার ঝড়ে দুলছে, তখন অদ্বুত শান্ত মালদা-মুর্শিদাবাদ। কারণ? সেখানে জমিদার মুসলমানরা যারা মুখল সাম্রাজ্যের সময় থেকেই জমিদার, পরে বৃটিশ ও বণহিন্দুদের সাথে কিছু আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন। এবং দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরাই মূলত কৃষক হওয়ায় অহিন্দু জমিদারদের উপর ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেনি। যদিও শ্রেণীগত শোষণ সমান সেখানেও। আরও লক্ষ করুন কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম বিভাজন শ্রেণী সংগ্রামকে প্রভাবিত করছে।

আরেক ইতিহাস, তেলঙ্গানা, নিজামশাহীর বিরুদ্ধে, জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্ধ্রপ্রদেশের বিদ্রোহ এলাকার কৃষকদের সংগ্রাম। করা সেই কৃষক? গিরিজান সম্প্রদায়ের দলিত-আদিবাসীরা। ধনী সংখ্যালঘু, নিজামশাহী, আর ধনী উচ্চবর্ণ জমিদারদের বিরুদ্ধে গরিব-দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরা একজোট শ্রেণী হিসেবে। কিন্তু, তারা সিংহভাগই দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘু। কিছু মার্কসবাদী যদিও এই জাতি-বর্ণ দলিত, ব্রাহ্মণবাদ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে চান না। তবু তাদের আজ ভাবতেই হবে যে তাদের বিপ্লবী শ্রেণীতে দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরাই দলে ভারি কেন? তারা কি এ দেশের জাতি-বর্ণব্যবস্থাকে উপরি কাঠামো ও মূলগত কাঠামো দুটিরই অংশ বলে এখনও ভাববেন না? আবার একই সাথে দলিত আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সাথী, যারা মার্কসীয় ভাবনাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না, তাদেরও ভাবতে হবে কেন বারবার পেটের তাগিদে - বৈষ্ঠ থাকার তাগিদে দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের ঐ মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামে মূল ভূমিকা নিতে হচ্ছে।

তেভাগা-তেলঙ্গানার সাথে আরেকটি নাম অনেকেই একইসাথে নিয়ে থাকেন, নকশালবাড়ী। 'যে চাষ করে জমি তার' এই দাবি নিয়ে শুরু হওয়া আন্দোলন পরে তার সীমা ছাড়িয়ে আরো বৃহৎ প্রসঙ্গে অবস্থান। কিন্তু উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ী থেকে মেদিনীপুর হয়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের বাইরেও। অস্ত্রের শ্রীকাকুলাম থেকে বিহারের চম্পারন-লখিমপুর খেঁরীতে বারবার দেখা যায় আবার আন্দোলনের সামনের সারিতে দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরা। জঙ্গল সাঁওতাল-বাবুল-বিশ্বকর্মকার-শোভান আলি-গুণধর মূর্মুর নামই বারবার শোনা যায়। উঠে আসে সেই শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতি-বর্ণবিরোধী সংগ্রামের আন্তঃসম্পর্ক একদম আন্দোলনের মাটিতে মূর্ত হয়ে। এই আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিক-কৃষকের রাজ স্থাপনের লড়াই। যাদের মধ্যে দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীরাই সিংহভাগ।

এবার আমরা চলে আসি বর্তমান সময়ের কাছাকাছি। নকশালবাড়ী ও বর্তমান সময়ের

মাঝে একদিক ছোট-বড় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সারা দেশেই চলেছে। সেই সবগুলিতেই ঐ একই আন্তঃসম্পর্কের প্রতিফলন দেখা গেছে। গদ ৬-৭ বছর ধরে চলা কৃষকদের উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রাম, যা বারবার আমরা দেখেছি কলিঙ্গনগর-গাজিয়াবাদ-সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-পকো-কাটোয়া-হরিপুর-কেরালা-জৈতাপুর-শ্রীকাকুলাম-গ্রেটার নয়ডা তামিলনাড়ুতে, তাতেও মূল ভূমিকায় সেই দলিত-সংখ্যালঘু-আদিবাসীরাই। আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব ও শহিদদের নামগুলি দেখলেই যা বোকা যায়। এ যাবৎকালের সবচেয়ে মারাত্মক উচ্ছেদ অভিযান, গ্রীন হান্ট, যা নামতে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী ও মুৎসুদী পুঁজির স্বার্থে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামেও দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘুরাই। গত ২-৩ বছর সারা রাজ্যে চর্চার বস্তু, লালগড় আন্দোলন, যার শুরু হয় পুলিশি সন্ত্রাসকে বিরোধিতা করে, তাও পর্যবসিত হয় জঙ্গলমহলের দলিত-আদিবাসী মানুষদের ইচ্ছাকৃতের লড়াইতে, যা আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী লড়াই এবং শ্রেণী সংগ্রামও। গত কয়েকমাসে গোরখপুর-গুরগাঁও-মারুতি-লুইয়ানার শ্রমিক আন্দোলনও বেশ নজর কাড়ছে। এবং সেইখানেও দলিত সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি ঐ আন্তঃসম্পর্কের দিকেই নির্দেশ করছে।

শেষের কথা হিসাবে একটা তথ্য দিতে চাই। ১৯২৪ সালে যশোর, খুলনা, বরিশালে রাস্তা ও রেল অবরোধের ডাক দেয় মতুরারা জমিদারপ্রথার বিরুদ্ধে ও সমস্ত ভূমিহীন কৃষকদের মালিকানায় জমির দাবি করে। পরবর্তীকালে মার্কসবাদীদের তোলা দাবি 'যে চাষ করে জমি তার' এর সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে কি? আন্দোলনের মাটিতে শ্রেণীসংগ্রাম ও জাতি-বর্ণবিরোধী সংগ্রামের আন্তঃসম্পর্ক প্রমাণিত। এখন তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও বলিষ্ঠ ঘোষণাটা একান্তই দরকার।



প্রতিবাদ চুনী কোটাল

২রা জুলাই দুপুর বেলা শূন্য মাঠের পারে
সড়কি হাতে একদল লোক আসছে গ্রামের ধারে।
কার হাতে লোহার কুঠার, কার হাতে লাঠি
কার হাতে ঝালসে ওঠে ধারাল অস্ত্রটি।
তাবলা নামক অস্ত্রখানি আছে কার হাতে,
শ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে বাঘঝাঁপ গ্রামটির পথে।

দূরন্ত খরা শূন্য মাঠ আকাশ ফাটা রোদ,
শস্যহীন রুদ্ধ মাঠের তবু নেইকো কোন শোভা।
কার ঘরে নেইকো ভাত নেইকো কোন আয়,
নেইকো কোন খাদ্যকলা, যে পেটটি ভরে খায়।

অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ কুকুর হেথা হোথা ঘুরে
তপ্ত রোদে কোকিল ছানা কুহ কুহ করে।
করণ সুরে রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশি,
সে সব শুনে চমকে ওঠে কদম ফুলের রাশি।

এমন সময় লোখা পাড়াটির যত পুরুষ নারী,
প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালায় গ্রামের পথ ছাড়ি।
বনের পথে দৌড়ে সবে দুধের শিশু ছেড়ে,
অস্ত্রধারী মানুষগুলো আসছে ওদের তেড়ে।

লোখার রক্তে রঞ্জিত হয় শস্যহীন মাঠ,
চারিদিকে তীব্র চিৎকার ধর, ধর, কাট, কাট।

কেউ ছুটে বনের পথে ডিঙ্গিয়ে ভোবা খাল
শীর্ণ বুড়ো গড়িয়ে পড়ে উঠতে জমির আল।

ঘটনটা ঘটে গেল, হল সমস্ত চূপচাপ
একটা দিন কেটে গেল রক্তে করল না প্রতিবাদ।
ঘর ছেড়ে লোখার দল বনে আশ্রয় নেয়
সাহায্যের একটু আশায়, অনেকে অফিসে ধর্না দেয়।
পরের দিন পুলিশেরা বনের ভিতর থেকে,
ছয়টি দেহ উদ্ধারিয়া ডাইরি খাতে লেখে।
৪ঠা জুলাই উল্লেখ হয় খবরের কাগজে
ছয়জন ডাকাত নিহত হয়,
৬০ বৎসরের বৃদ্ধকে ধর্ষণের অপরাধে।
এই দেশেতে নেই কি কোন আইন আদালত?
ন্যায় অন্যায়ে কোন বিচার কি, এদের জন্য নয়?

(১৯৮২ সালে ২ জুলাই ঝাড়গ্রামের সোরো, চাকুয়া, বাঘঝাঁপা গ্রামের হত্যাকাণ্ড স্মরণে এই কবিতা)



4 kms from district headquarters of Angul in Orissa, tied up a young Dalit woman Sanju along with her three-year old girl to a pole in the village and tortured her for nearly four hours

বিপ্লব

অর্জুন ডাঙলে

ভাষান্তর - সুশান্ত সরকাষ

আমরা তো ওদের বন্ধুই ছিলাম
মাটির ভাঁড় যখন গলায় বুলিয়ে রাখতাম আর
কাঁটাও যখন পাছায় বেঁধে রেখে
বড়রাস্তায় খুঁদে বেড়াইতাম
'মা-বাপ, জোহর, মা-বাপ' বলতে বলতে

কাকের সঙ্গে মারামারি করেও তো
আমাদের চক্ষু ওদের দিই নি কখনো
বড় রাস্তার মৃত গোরু-মোষ যেমন কুপিয়ে, ঠুকরে
দিবি ছাল ছাড়িয়েছি, আর
নিজেরা মাংস ভাগাভাগি করে নিয়েছি তারপর।
ওরা তো আমাদের ভালই বাসত
শেয়াল-কুকুর-শকুন-চিলের সঙ্গে আমরা লড়াই করে
ওদের খাবারেও তো ভাগ বসিয়েছি।

ইদানিং আমরা আপাদমস্তক পরিবর্তন দেখছি
কক-শেয়াল-কুকুর-শকুন-চিলেরা
আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে।
বড় রাস্তার দরজাগুলো আমাদের কাছে এখন বন্ধ।

জ্বালাও, জ্বালিয়ে দাও যারা আঘাত হানে।



সংকটগ্রস্ত ধর্ম অথবা/এবং বিপ্লব প্রান্তবাসী কৌম

অনন্ত আচার্য

বৈশিষ্ট্যগণ মানুষের শরীরের বাম হাত-বাম পা, ডান হাত-ডান পা-এর তুলনায় দুর্বল হয়। ঠিকিৎসকের মতো এটা নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক কোবের প্রভাব। কোনও বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই এ কারণে দুর্বলতার অংশকে বাতিল-অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দেবেন না। এতো চুল-দাড়ি নয় যে যেটি কেটে দিলে আবার গজাবে। বহু কাজেই দুজোড়া হাত-পা ব্যবহার করতে হয়। আমাদের সমাজ কাঠামোয় এভাবেই বহুজনকে দুর্বল, অপ্রয়োজনীয় এবং কার্যতঃ বাতিল সাব্যস্ত করা হয়। মনুসংহিতায় শূদ্র ও নারীর অধিকার খন্ডনের নির্দেশ আছে। শূদ্র ও নারীর চাকরীসহ সব ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা উঠলেই আধুনিক মনুবাদীরা (যাদের মধ্যে অনেক প্রগতিশীল, সমাজবাদী, মার্কসবাদীও আছেন) 'গেল গেল' রব তোলেন। 'ক্যা' মেগাও কথা তোলেন, কেউ বা শ্রেণীসংগ্রাম ব্যাহত হবার আশংকা প্রকাশ করেন। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা আরবদেশ থেকে আসেনি। এটা অনেকেই জানেন যে মধ্যযুগে নাগরগাঁয় সমাজের একাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে ধর্মপরিবর্তনের পথ বেছে নেয়। শ্রমজীবী ও নব্য মুসলমানরা দুধ-ঘি-এর কন্যায় ভেসে গেছেন এমন নয়। উপরন্তু গোড়া তপস্বীদের কাছে তারা 'ঘর-গেরস্তালির কাজ ছেড়ে অন্য বাড়িতে কাজ নেওয়া পানী'র মতই না পসন্দের। মাঝেমধ্যেই দাঙ্গার মাধ্যমে রাষ্ট্র জানান দেয় যে এদেশে আমাদের বৈধ থাকার টাই উপরি পাওনা। চাকরী, শিক্ষা, সর্বোপরি মর্যাদা থেকে দূরে রেখে শূদ্র ও নারীদের মতই তাদের বাতিল-অপ্রয়োজনীয়-অক্ষম সাব্যস্ত করা হয়। পেশায় পুলিশ অথচ কবি, সংগীতরসিক আয়ান রসিদ খান সেভেছ ম্যান নামক একটি তথ্যচিত্রে ১ জন কলকাতাবাসীর ১ জন মুসলমানদের পেশা, আর্থিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান পরিস্থিতি সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। নন্দন-অ্যাকাডেমি কবিতা নাটক ফিল্ম-উৎসব, লালিমাগ, কমিউটিস প্রভাবিত বিদ্বজ্জন ঐ তথ্যচিত্রটিকে গুরুত্ব দেননি। সাচার কমিটির রিপোর্ট পক্ষাঘাত হবার পরও এঁদের বিশেষ হেলদোল নেই। অথচ ঐ রিপোর্ট জানাচ্ছে যেমন বাংলাদেশে অধিকসংখ্যক মুসলমান বাস করে তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং আসামে মুসলমানদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এমতাবস্থায় মুসলমানদের সংরক্ষণ বা অন্যান্য সংস্কার, উন্নয়ন বা সুযোগ সুবিধার সুপারিশ এলেই আধুনিক মনুবাদীরা 'প্যান ইসলামিজম'-এর গন্ধ পান। প্রান্তবাসী সমাজ নিয়ে যারা 'মহান আধুনিকবাদীরা এবং/অথবা এন.জি.ও' 'করে কন্ডে খাচ্ছে' তাদের ভূমিকাও

সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়।

দাঙ্গা হল সাম্প্রদায়িকতার একটি সহজবোধ্য বহিঃপ্রকাশ, যা নেহাতই আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন। একধরনের রক্তপাতহীন সাম্প্রদায়িকতা সত্যতই বিন্যাস, যা আমাদের দেশবাসীর এক বিপুলাংশকে মূলস্রোত থেকে প্রতিদিন সরিয়ে নিচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টির চর্চার প্রয়োজন আছে। সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টদের বৃহৎ যখন 'বৈষম্য ধর্মে' দীক্ষিত হয়েছে (কাউটস্কি-ত্রুশ্চভ দীর্ঘজীবী হোক), বিশ্বায়নের মৌতাতে বিভোর হয়ে বিশ্ববিকার অভিমুখ বদলে ফেলেছে তখন এটা ভাবার কারণ নেই যে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ তার অস্ত্রের বনবনানি বন্ধ করবে বা স্থায়ী-অস্থায়ী শত্রুশিবিরের সন্ধান করবে না। গত ২/৩ দশকে বিশেষতঃ ইরাক, আফগানিস্তান যুদ্ধ বা ৯/১১-র পর মার্কিন শাসকদের নিদ্রাহীনতার কারণ ঘট হয়েছে তথাকথিত মুসলিম দুনিয়া। হাঙ্কাভাবে বলা যায় যে আরবি নামধারী মাত্রই এখন সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত প্রচারে সন্ত্রাসবাদী। উদাহরণ — তারিক আজিজ (সাদাম মন্ত্রীসভার সদস্য, জন্মসূত্রে বিশ্বাসে খৃষ্টান), জিদান (ফ্রান্সের ফুটবলার - মুসলিম ধর্মীয় আচরণরহিত), চিত্রাভিনেতা আমির খান (হিথরো বিমানবন্দরে ৬ ঘণ্টা অটকে রাখা হয়েছিল), অভিনেতা কমল হাসান (সাতকুলে কেউই মুসলিম নয় - পরিবর্তিত ফিল্মনাম)। নিম্নবিত্ত মুসলমান মাত্রই যেন জন্ম অপরাধী। বাঙ্গালোরে চিকিৎসক হানিফ বা কাশিপুরের শ্রমিক আনসারিই হোক, অভিযোগ ওঠে লাদেনের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। যদিও এই মুসলিম দুনিয়ার এক সামান্য অংশই মুতাজ্জেলা ভাবনার (আরব দুনিয়ার জিজ্ঞাসু চিন্তা—৮০০ খ্রীঃ) মুক্তচিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। অধিকাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দেশিত হচ্ছে এক গোলমালে ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা, যাদের নীতিনির্ধারণ বা পরিবর্তনের পেছনে কোন আদর্শবোধ-যুক্তিবোধ কাজ করে না। ৮০০ খৃষ্টাব্দে আরব দুনিয়ায় বিজ্ঞান চর্চার এক প্রাবল্য হয়ে গিয়েছিল যা পরিবর্তিত হয় ইসলামের স্বর্ণযুগ বা মুতাজ্জেলা আন্দোলন নামে। নব্য মুতাজ্জেলাবাদীদের সংগঠিত উত্তরসূরীরা এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ২০০৭-এর জুলাই মাসে এদের সম্মেলন হয় ইস্তাম্বুল এবং জাকার্তায়। কামাল পাশার অনুগামীরা সারা পৃথিবীতেই সংগঠিত হবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক।

সার্কাস শ্রোকের মধ্যে দুরন্ত গতিতে মোটর সাইকেল চালানোর খেলা যখন চালু হল তখন এক 'ওস্তাদ' চালক, হরিমাধবন হিন্দু পত্রিকার সাক্ষাৎকারে জানান যে মাইনে নয়, অ্যাডভেনচার নয়, খেলার শেষে সমস্ত দর্শকের হাততালি তাকে রোজ তাঁবুতে যাবার রসদ জোগায়। হরিমাধবন একজন সাধারণ মানুষ, দর্শকদের নির্ভেজাল আনন্দ দেওয়াই তাঁর কাজ। কারও ক্ষতি করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। কারও কারও কথা বলা

যায় যাদের প্রায় প্রতিদিনের আচরণ সমাজে ক্ষতিকর প্রমাণ হলে।

তার আগে একটি সোজা অংক কয়ে ফেলা যাক —

যশলোভ + বিতর্ক প্রেম + কান্ডজ্ঞানহীনতা + অপশক্তির প্রশ্রয় = ফেম্ কোহলিজম।

সংক্রামক ফেম্ কোহলিজম-এর শিকার একজনের নাম হতে পারে ইম্রিশ আলি। ১৯৮৯ সালের গতি পত্রিকার (পরে নাম বদলে নতুন গতি) ইন্দু সংখ্যায় ইম্রিশের নাম প্রথম ছাপা হয়। পত্রিকা আয়োজিত এক চতুর্ভুজীয় ইম্রিশ তরল রসদরস পরিবেশন করছিলেন— সেই বৃত্তান্ত। ইম্রিশের 'নেশার হাতেখড়ি' সেই সময়েই। এরপর যত দিন যায় ইম্রিশের একমাত্র কর্ম প্রচার মাধ্যমের আলোকে আলোকিত হবার নির্লজ্জ ক্রান্তিহীন প্রয়াস। বৈদ্যুতিক মাধ্যম চালু হবার পর তার সফলতা কেবলমাত্র মূল সাক্ষাৎকার দাতার (মাধ্যমের ভাষায় যার 'বাইট' নেওয়া হয়) পাশে নীরব অবস্থান। এক অভূত কুরটিকর আশ্বমেধুণ বিলাস।

যে ইম্রিশ, সংবাদপত্রের কর্মীদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল, নভেম্বর '০৭-এর একদিনের ঘটনায় সে হয়ে উঠল মাধ্যমের কাছে 'মোস্ট ওয়াণ্টেড ম্যান'। তার সর্বভারতীয় সংখ্যালঘুদের সংগঠনে না আছে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ বা অন্যান্যদের উপস্থিতি, না আছে রাজ্য বা দেশের অন্য স্থানের প্রতিনিধিত্ব। গল্পে আছে যে হনুমান নিজের ল্যাজের আগুন নেভাতে না পেরে এত দৌড়ঝাপ করেছিল যার ফলে লঙ্কার রাজপ্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হয়। যশলোভী কান্ডজ্ঞানহীন ইম্রিশের সূচনায় একটি কু-নাটক আমাদের দুনিয়ার সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিল আয়ান রসিদ খানের সেভেছ ম্যানদের। সাচার কমিটি বা পারেনি, বৈদ্যুতিক মাধ্যমের চ্যানেলে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোসাল স্টাডিজের অধিকর্তা সুগত মার্জিতকে বলতে হয় যে তারা ডাইভারসিটি ইন্ডেক্স প্রোজেক্টে সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে কাজ করবেন এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবেন। পার্কসার্কাস ময়দানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করতে হয় যে এটা লজ্জার কথা যে সরকারী চাকরীতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব কম।

ফেম্ কোহলিজম-এর আর এক শিকার কি তসলিমা নাসরিন? তাঁর বিষয়ে আসার আগে বরং পেটিং-এর বাজার দর (নাগপালের হিসাব অনুযায়ী) জানা যাক। বিকাশ ভট্টাচার্য, গণেশ পাইনের চিত্রকলার বাজারদর বেশ চড়া। সরস্বতী ও মাধুরী দীক্ষিতকে বিবসনা করে বাজারে পিছিয়ে পড়া মক্বুল ফিদা হুসেন গৃহে স্বাচ্ছন্দ্য এবং গৃহের বাইরে পরিচিতি বহুগুণ বাড়তে সক্ষম হলেন। বিতর্ক এবং বাণিজ্য যদি হাত ধরাধরি করে

সমান গতিতে এগোয় তবে যেকোন সৃজনশীল কাজের মান হ্রাস পেতে বাধ্য। তসলিমা এই রোগের শিকার হলে তো সর্বনাশ। বিশেষ করে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যম যখন একটি নিরীহ ও শক্তিশালী অস্ত্র — কলম, এবং তিনি নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক বলেই সমাজে পরিচিত। ইদ্রিশের ক্ষেত্রে অবশ্য সে ভয় নেই। কোন মতবাদ বা দর্শনবোধ তাঁর আছে বলে বোঝা যায় না।

দুই বাংলার নারীবাদ বা নাস্তিকবাদের চর্চা বহুদিন চলছে। আরজ আলি মাতুব্বর প্রশ্ন তোলেন : সৃষ্টিকর্তা যদি সবই সৃষ্টি করিয়াছেন তবে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করিল কে? ছমায়ুন আজাদের 'নারী' পাঠ করলে জানা যায় ওগ্রাভে নারী অধিকার আন্দোলন কতটা মজবুত। লেনিন-এর নারী-পুরুষ সম্পর্ক (গ্লাস ও জল - উল্লেখ্য) বিষয়ে আহমেদ শরিফ, বদরুদ্দিন ওমরের রচনাও উল্লেখযোগ্য। ঢাকার মুক্তমন গোষ্ঠী এবং অন্য অনেক প্রকাশনা সংস্থার কাজ ওগ্রাভের ধর্মাত্মতা বিরোধী সংগ্রামের সজীবতার পরিচায়ক। মানগত দুর্বলতার কারণে বাজার সংকুচিত হবার আশংকা থেকেই অনেক লেখক বিতর্ক নামক অস্ত্রিজে সিলিভার সাথে নিয়ে চলমান। আমিই যুক্তিবাদের প্রথম ও শেষ কথা বলার হক্কার — এরকম নির্বোধ দাবীদার কোলকাতাতেই আছে।

মাকেমথোই এদের অবশ্য বিপদে পড়তে হয়। গল্পের হনুমানের যেমন ল্যাজের আগুনে মুখ পুড়ে যায় বা সার্কাসের খেলুড়ের হাত-পা ভাঙ্গে।

মিনা আহাদী এবং মরিয়ম নমাজী নামে দুই ইরানী (বর্তমানে পেশার টানে জার্মানবাসী) ইউরোপের প্রগতি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। সব ধরনের ধর্মাত্মতার বিরুদ্ধে জেহাদ তাঁদের রচনায়-আলোচনা সভায়-মিছিলে। ইসলামে (অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেও) নারীর অবস্থান নিয়েও তাঁরা সরব প্রতিবাদী। মুসলিমপ্রধান দেশগুলির উপর মার্কিনী হামলা-হুমকির বিরুদ্ধে তাঁদের নিরলস কর্মসূচী প্রশংসার দাবী রাখে। বুশ-শাসনে সারা দুনিয়া জুড়ে 'ইসলামোফোবিয়া' প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তাঁরা নিজেদের ধর্মরহিত অবস্থানকে দৃঢ় রেখেছেন। গড়ে তুলেছেন সংগঠন যার নাম সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ এক্স মুসলিমস। এদের কাজকর্ম সম্পর্কে ইউরোপের সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল হচ্ছেন। যে কোন প্রতিবাদ, বিরোধিতা বা আন্দোলন যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং দর্শনহীন হয় তাহলে তা সাধারণের কোন কাজে আসে না। বরং কখনো কখনো তা উন্টে ফল দেয়।

হাওড়া স্টেশনের কোলানো সাইনবোর্ডের বিজ্ঞাপনের ধাঁধার প্রসঙ্গে আসা যাক। সাইনবোর্ডে লেখা আছে — তের কাপ নুন। আসলে ওটা : ত্রীতের কাপড় কিনুন - এর বিজ্ঞাপন। নিম্নরেখ বর্ণগুলি সময়ের ডাকে অদৃশ্য হয়েই বিপত্তি। বিশ্ব পরিচিত দার্শনিকের উদ্ধৃতি (ধর্ম জনগণের আফিম) নিয়ে ধার্মিক এবং না-ধার্মিক মহলে চটকানি কম হয়

না। উদ্ধৃতিটি আগা-পাশ-তলা (নিঃসম্বলের সম্বল, আর্ডের দীর্ঘনিঃশ্বাস) না পড়লে সাইনবোর্ডের দর্শকের মত বোকা বনতে হয়। অজ্ঞ ধার্মিক, না-ধার্মিকের দল এগুলো না জেনে ভুল পথে হাঁটেন। অবশ্য ইদ্রিশ, তসলিমা অজ্ঞ নয়। এদের হাতে অন্য কেউ তামুক খেয়ে যাচ্ছে না তো?



নোনাডাঙ্গা সহ দক্ষিণ পূর্ব কোলকাতার আকাশে মহিচরীপির কালো মেঘ

স্বাধীন

নোনাডাঙ্গার ছিন্নমূল বসিন্দারা আশ্রয় ঘর চাননি। ৬৬ই মার্চের পুঁজি পর্বের বাইপাসের পথের মোকদদর বসতি দু'তরফের ঘরের নিচিহ্ন। হাজার সরকারি কলমে অর্থাৎ "অপারেশন সানসাইন" এর প্রকল্প "অমর" সুপ্রাচ্য চরবর্তীর সরকারের নির্দেশ এবং পণ্ডিত হচ্ছে। বিশেষ পুঁজির নগর কাগজে "নগর সৌন্দর্য" বাগুতে চক্করী অবস্থার সমস্ত গাছী নিরীতে একই ধরনের কাজ করেছিল।

যে দিন অমরকরই নগর এড়িয়ে যায় যে এই সব উচ্ছেদের শিকার ব্যাপক মনুর অধিক কার্যেই জেনে পরিচিতির মিত্র, তেঁকেই সাময়িক, জটিলত, ধর্মগত কার্যেই এমনি - এমটি - ও বি সি এক সংবাদপত্র সম্পাদক তুলে। তাই এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মধ্যে মধ্যে এই সব সাময়িক কৈশোরের বিরোধ কর্ম সূত্রেতে অগতঃ হবে। মনুবা ও অমরের মতী মর্শন হবে।

অনুন্ন বিশ্বব্দের মধ্যে, টারগনের বাহনর পণ্ডিত, অসিয়ারী, সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে কোনো সরকারের মুখে মোকদর বিরুদ্ধে সারব হই। অন্যতম সগ্রহ করি। পূর্বতম সরকারের অপসারণের বাহান দিয়ে মেনে নতুন সরকারের অপকর্মের প্রতি মর্শনীর না হই। যে সব বিশ্বাসের রিপত সরকারের বিরুদ্ধে সংগত কারণে মোকদর হিসেব, টেসের কাছে অমরেন যে আপনাদের ঐতিহাসিক গনতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা অতিবে নান প্রসেতনে, অতুহাতে অসম্পূর্ণত হবে না।

দুনিয়ার সবকিছু মনুবা এক হও। পণ্ডিতরা ঐক্যবদ্ধ হোন - বলিভাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হোন

- ১) অমরকর যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- ২) প্রেসী সগ্রাম, প্রেসী ঐক্য করার মধ্যে এমনি - এমটি - ও বি সি - সংবাদপত্র - মহিলাদের অধিকার অমরকর গড়ে তুলুন।
- ৩) সন্ন্যাসবাদ, ব্রহ্মচর্যের কল থেকে চারতরফের মুক্ত করুন।
- ৪) বিশেষ পুঁজি ব্যবস্থার করে মুক্ত ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ করুন।
- ৫) "সমাজ সেবক" ছদ্মবেশী যন্ত্রেতে এমটি ও সম্পূর্ণ সতর্ক হোন।

প্রেক্ষা সারের পত্রিকা সংগ্রহ করুন।

ডাফদওয়াম (ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন ফোরাম অফ মলিভাস, গুডেন এ্যাক্ট মাইন্ডিটম) -এর সঙ্গে অন্য
স্বাক্ষর - ৩০/২ এমপি রোড, কলিকাতা-৫৫ - ফোন : (০) ২৩৩২৮৮৮১১ - dafoedwam@gmail.com কর্তৃক প্রকাশিত।